অদ্বিতীয়া

সুশীল রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

শ্রীমতী করবী সেন

করকমলেষু

অদ্বিতীয়া

॥ এক ॥

অনেক দূর পথ পার হয়ে এসেছে এরা। অনেক ঘুর পথ ঘুরে এসেছে।

জীবনে এমন প্লাবন হয়তো মাঝে মাঝে আসে সকলেরই। এবং এমন প্লাবন যে আসে সেইটেই জীবনের যেমন যন্ত্রণা, সেইটেই জীবনের সান্ত্বনাও তেমনই। জীবনের চারিপাশ বাঁধিয়ে জীবনকে নিশ্চল জলাশয় করে তুলতে চাই আমরা ক'জন? জীবনকে নদীর স্রোতের মতন অবারিত করে দিতেই বুঝি আমাদের মধ্যের অনেকেরই ইচ্ছে।

হঠাৎ এই রকম ইচ্ছে যখন এসে হানা দেয়, তখনই আমাদের জানা হয়ে যায় যে, আমাদের জীবনে একটা প্লাবন এল। আমরা তখন সে-প্লাবনে গা ভাসিয়ে দিতে ভালোবাসি। ভালোবাসি, কেন না প্লাবনের সুফলও একটা আছে। বিপর্যয় যেমন ঘটায় এ, ফসলও তেমনি ফলায়। জীবনকে উর্বর করে দেয়। যদি কেবল বিপর্যয় করাই পেশা হত এই প্লাবনের, তাহলে প্লাবনকে প্লাবন হয়তো আমরা বলতাম না, এর আর একটা নাম দিতাম, হয়তো বলতাম—সর্বনাশ।

মনের মধ্যে খুশি ও ইচ্ছেরা ধীরে ধীরে জমে উঠে ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে, এবং সেই দানা এক সময়ে এমন বড় হয়ে যায় যে, মুঠির মধ্যে তাকে ধরে রাখা দায় হয়ে ওঠে। তখন তাই আমরা তাকে আর ধরে রাখতে চাই নে, তখন আমরাই তার কাছে নিজেদের ধরা দিই।

এই রকমই ধরা দিতে হল ওদেরও। চলন্ত ট্রেন থেকে কতবার দেখেছে ওরা মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা সটান সোজা কোথায় যেন চলে গিয়েছে। মাঠের পাশে দেখেছে ওরা বিরাট বিশাল বিপুল আকারের পুরাতন অট্টালিকা।

কোথায় গিয়ে শেষ ওই রাস্তার, কোথায় ওর আরম্ভ। কি আছে ঐ অট্টালিকায়, কে বাস করত একদা ওখানে, কে বাস করে এখন ওখানে? এই প্রশ্নগুলো জমতে জমতে মস্ত একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে উঠল ওদের কাছে, সেই সঙ্গে ওসব জানার ইচ্ছাও বড় হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

প্রাণের যাবতীয় প্লাবন একত্র ক'রে ওরা ছ'জন জোগাড় করল একটা গাড়ি। এই বাহনে চেপে অভিযানে যাবে তারা।

মনের বিপুল ইচ্ছা জমা করে নিল তারা। পোষ মাসের শীতের সকালে ছ'জন যাত্রী একত্র হয়ে রওনা হল বেহালার রায়বাহাদুর রোড থেকে।

মসৃণ দ্রুততায় পীচের রাস্তা ধরে অনেকক্ষণ হল ছুটে চলেছে গাড়িটা। অনেকগুলো পথ পার হয়েছে, অনেক বাঁক নিয়েছে। তবু তেজ কমে নি গাড়িটার।

গাড়িটা চলেছে গান গাইতে গাইতে; আশপাশের গাড়ি ও বাড়ি অতিক্রম করতে করতে, এবং সেই সঙ্গে উচ্চকিত করতে করতেও। যাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা, তাদের কানে একখণ্ড গানের কলি বাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। কিসের শব্দ এটা, সে-কথা ভালো করে বোঝবার আগেই গাড়িটা সামনের বাঁক ঘুরে চলে গেল চোখের আড়ালে।

চোখের আড়ালে চলে গেল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঝাঁকি রেখে গেল যেন! অতটুকু একটা গাড়িতে অমন ঠাসাঠাসি করে বসে কোথায় চলেছে ঐ একঝাঁক মানুষ?

অনেকগুলো বাঁক পার হয়ে এসেছে গাড়িটা। অনেকগুলি মানুষের মনেই এ রকমের প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে একবারও গাড়িটা তো থামলই না, এমন কি তার বেগও কমল না এতটুকু।

অট্টহাস্যের শব্দ ছড়াতে ছড়াতে আর গানের কলি বিলি করতে করতে ছুটে চলে গেল পুরনো মডেলের একটা বেবি অস্টিন।

রাস্তার লোকে ব্যঙ্গ করেছে, বলেছে, যেমন গাড়ি, তেমনি তার সওয়ার। গাড়ির চাকা আবার খুলে না যায়!

চলন্ত গাড়িতে বসে তারা চাকার কথা হয়তো এখন ভাবছে না। কিন্তু চাকা নিয়ে গবেষণা তারা করেছে আগে। যখন এই অভিযান নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর গবেষণা হয়েছে তখন অনেক কথার সঙ্গে চাকার কথাও তারা ভেবেছিল।

তাদের এই অভিযানের প্ল্যানটা হয়ে উঠল হঠাৎ। কেউই এর জন্যে তেমন তৈরি ছিল না। কিন্তু কথাটা যখন উঠল তখন দেখা গেল যে, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আলাদা আলাদা ভাবে এ ধরণের একটা আকাঙ্ক্ষা জমা ছিলই।

ওদের দলের মধ্যে স্নেহাংশু একটু কবি-ভাবাপন্ন। কিন্তু কবিতা সে বেশি লেখে না, কবিতা নিয়ে আলোচনা অবশ্য করে। কবিতা লেখে না বটে, কিন্তু নাটক লেখে, এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীদের যেসব গান গাওয়ার কথা, সেসব গানও লেখে স্নেহাংশুই। স্নেহাংশুর লেখা তিন-চারটি একাঙ্ক নাটক তারা দল বেঁধে অভিনয় করেছে, এবং অভিনয় করতে করতে তাদের দলটাও বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে।

বেহালার রায়বাহাদুর রোডে গড়ে উঠেছে তাদের নাট্য-আসর। সেখানে অভিনয়ের রিহার্সেল লেগেই আছে। পাড়ার লোককে বিরক্ত বা বিব্রত না করে দরজা-জানলা এ'টে দিয়ে তারা চালায় তাদের মহড়া। তারপর যখন খোলা মাঠে স্টেজ বে'ধে অভিনয় করে তখন পাড়ার লোকও আসে দল বে'ধে সেই অভিনয় দেখতে।

নাটকগুলো ভালই লিখেছে স্নেহাংশু। আইডিয়াও যেমন তার নতুন, আবেদনও তেমনি নতুন। স্নেহাংশুর তাই বেশ আদর হয়েছে পাড়ায়, এবং আদরের সঙ্গে একটু দরও হয়েছে।

অমিয় তরফদারদের বাড়িটা বেশ বড়। তাদের বৈঠকখানা ঘরের পাশের ঘরটা হয়েছে এদের নাটকের আসর। এখানে জমা হয় সকলে—রেবতী মল্লিক, মনোজ সান্যাল, বিকাশ নন্দী, হরেশ, দীপক, নীহার, বীরেন ইত্যাদি পাড়ার অনেকেই। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন অভিনয়ে পাকা, বড় বড় ভূমিকায় এরাই অভিনয় করে। কিন্তু ভূমিকা কতবড় আর হতে পারে? যে নাটকের মেয়াদ মাত্র একটা অঙ্ক, তার ভূমিকা আর কতবড় হবে?

কারও ভূমিকাই যে বিশেষ বড় হচ্ছে না—এ আক্ষেপ অভিনেতাদের যেমন আছে, নাট্যকারেরও আছে তেমনি।

সুতরাং সুতরাং সুতরাং—

স্নেহাংশু কিছুদিন থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে বেশ ভালোভাবেই যেন ভাবছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে এসে অমিয়কে ডাকল।

'কি রে স্নেহাংশু?'

স্নেহাংশু বলল, 'কথা আছে।'

বৈঠকখানা ঘরেই বসল দুজন। স্নেহাংশু বলল, 'আর কারও আক্ষেপ রাখতে চাই নে।'

'কিসের আক্ষেপের কথা বলছ হে?'

স্নেহাংশু একটু হাসল, বলল, 'ছোট ছোট পার্ট পায় ওরা। রেবতী, মনোজ আর বিকাশ—এ নিয়ে প্রায়ই দুঃখ করে। তাই বড় পার্ট লিখেছি ওদের জন্যে।'

একটু ঝু'কে অমিয় জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম?'

চাদরের নীচে থেকে বিরাট একটা বাণ্ডিল বের করে টেবিলের উপর রাখল স্নেহাংশু, বলল, 'এই।'

'কি এটা?'

'নাটক। একাঙ্ক নয়, পঞ্চাঙ্ক। পাঁচ অঙ্কে শেষ।'

'বলো কি হে?' আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল অমিয়, বলল, 'তুমি তো বড্ড চাপা হে স্নেহাংশু। এতবড় একটা কাণ্ড করে বসলে, কিন্তু কাক-কোকিলে টের পেল না?'

স্নেহাংশু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'কেবল পঞ্চাঙ্কই নয়, এতে নারী-ভূমিকাও আছে। এখন ভাবনা এই—নারী সাজবে কে?'

অমিয় কিছু মন্তব্য করল না। সে ভাবতে লাগল স্নেহাংশুর কথা। অবশেষে সত্যিসত্যিই স্নেহাংশু একজন নাট্যকারই হয়ে উঠবে নাকি? একজন নামজাদা নাট্যকার হয়ে উঠবে নাকি বেহালার স্নেহাংশু বিশ্বাস? একথা বিশ্বাস করতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে অমিয়র, কিন্তু ঠিক যেন বিশ্বাস করতে সে পারছে না।

অমিয় একটু চাপা গলায় বলল, 'আমরা আমাদের জীবন যদি নারী-বর্জিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের নাটকই বা নারী-বর্জিত হবে কেন। আসলে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনই তো এক একটা নাটক, কি বলো হে নাট্যকার?'

স্নেহাংশু বলল, 'বটেই তো।'

এরা কথা বলছে, এমন সময়ে বিকাশ আর মনোজ এসে উপস্থিত হল। ওরা ঘরে ঢুকে দেখল দুটি প্রাণী চুপচাপ বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

মনোজ ওদের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার হে? কোনো শোক-সংবাদ আছে না কি? দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী হয়ে বসে আছ যে!'

অমিয় বলল, 'বসো ভাই। ব্যাপারটা গুরুতর।'

বিকাশ আর মনোজের মুখের ভাব বদলে গেল, তারা যেন একটু চিন্তিতই হয়ে উঠল, যাতে শব্দ না হয় এই রকম ভাবে আস্তে চেয়ার একটু এগিয়ে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'কি?'

অমিয় বলল, 'সাংঘাতিক ব্যাপার। স্নেহাংশু যে এমন ডুবে ডুবে জল খায়, কে জানত বলো।'

স্নেহাংশুর মুখের দিকে ওরা একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ওদের তাকানোর ভঙ্গি দেখে হাসি পেল স্নেহাংশুর, তার ঠোঁটের উপর বেশ খুশির রেখা ফুটে উঠছে দেখে বিকাশ বলল, 'বুঝেছি। ব্যাপার সাংঘাতিক হওয়াই সম্ভব।'

মনোজ তৎক্ষণাৎ বলল, 'বুঝেছি—প্রেম।'

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বিকাশ বলল, 'বলো বৎস, কে সেই হতভাগিনী।'

অমিয় ওদের চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'আস্তে। ভেতরের বারান্দায় বাবা-মা বসে।'

জিভ কাটল বিকাশ।

মনোজ তার ভুরু দুটি নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল ফিসফিস করে, 'কে, কে?'

স্নেহাংশু বলল, 'সব বলব। স্থির হও।'

স্নেহাংশু অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। একটা আশ্বাস দিয়ে এভাবে চুপ করে থাকার মধ্যে কোনো নাটকীয় টেকনিক আছে কিনা ভাবতে লাগল অমিয়। হয়তো আছে। হয়তো সাসপেন্স সৃষ্টি করা হয় এইভাবেই। অমিয় নাট্যকার নয়, তাই ও-সব কায়দাকানুন সে জানে না। কিন্তু এতগুলো কথার মাঝখানে হঠাৎ এভাবে তার চুপ করে থাকাটার মধ্যে সে যেন কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না।

অমিয় কোনো যুক্তি খুঁজে পেল না বটে, কিন্তু মনোজ আর বিকাশ সবটা যুক্তিই যেন খুঁজে পেয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, এবার ডুবেছে তাদের নাট্যকার—তাদের এই একাঙ্ককার, এবার নির্ঘাৎ ঘটাবে একটা কেলেঙ্কারি।

কিন্তু একাঙ্ককার যে ইতিমধ্যে পঞ্চাঙ্ককার হয়ে গিয়েছে—সেই কথাটাই এখন পর্যন্ত তাদের জানা হল না।

আসল কথাটা তাদের জানা হল না বটে, কিন্তু আন্দাজের কথাটা তাদের কাছে যেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যে বিকাশ পুনরায় সেই প্রশ্ন করল—'কে সেই হতভাগিনী?'

গলাটা এবার একটু সাফ করে নিল স্নেহাংশু বিশ্বাস। একটু হেসে সে বলল, 'একটা হতভাগিনীতে হবে না ভাই, এবার চাই একের অধিক।'

'কেন, কেন, কেন?' একটু ঝুঁকল, একটু জমাট হয়ে বসল বিকাশ।

স্নেহাংশু বলল, 'কেন আবার কি! তোমাদের জন্যেও চাই এক-একটি পার্টনার।'

অমিয় মজাটা বুঝি উপভোগ করছে। তাই কোনো কথা বলছে না। বারান্দায় বাবা-মা বসে আছেন বলে একটু অস্বস্তি বোধ করছে সে। উঠে গিয়ে তাই ভিতরে যাবার দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ফিরে এসে বসেই অমিয় বলল, 'থাক্। অনেক বাজে কথা হল, এবার কাজের কথায় আসা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—'

অমিয় কথাটা বলতে যাবে, এমন সময় একটু বাধা পড়ল, বাইরের দিকে চেয়ে অমিয়ই বলল, 'এই যে, এস রেবতী, এস।'

রেবতী আসায় আসরটা যেন একটু ভারি হল। নাট্যকার স্নেহাংশু বিশ্বাসের নাটকের পাকা অভিনেতাদের মধ্যে রেবতী একজন।

রেবতী বসতে বসতে সবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? পরিস্থিতিটা একটু যেন নাটকীয় বলে ঠেকছে? নতুন নাটক-ফাটক আবার করছ নাকি তোমরা? কি হে, খুলে বলো।'

খুলেই বলা যাক তবে? অমিয়র এই প্রস্তাবে সকলে রাজী হল।

ব্যাপারটা খোলসা করে বলা হল এই আসরে।

সব শুনে রেবতী বলে উঠল, 'একাঙ্ক থেকে একেবারে এক লাফে পঞ্চাঙ্ক? তুমি সব পার হে স্নেহাংশু, তুমি নমস্য, তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করি—এমন সাধ্য কি আছে আমাদের?'

মনোজ আর বিকাশ দুজন দুজনের মুখের দিকে একটু তাকাল, তারপর মনোজ বলল, 'আর কথা নয়। কথা আর দ্রৌপদীর শাড়ি—একই ব্যাপার, টানলেই বেড়ে যায়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না, যে উদ্দেশ্যে টানা তা—'

সকলে অট্টহাস্য করে উঠতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল, তাদের মনে পড়ে গেল যে, এটা তাদের রিহার্সেলের ঘর নয়, এটা অমিয়দের বৈঠকখানা-ঘর।

রেবতী দম নিয়ে বলল, 'বেড়ে বলেছ। টানাটাই অযথা হয়ে যায়। সুতরাং আর কথা নিয়ে টানাটানি করা না হল, এবার কাজ হোক।'

কিন্তু তাদের এখানকার যা কাজ তাও তো কথা দিয়েই সারতে হবে, সুতরাং আরম্ভ হল আবার কথাই।

কথা হওয়া উচিত ছিল প্রথমেই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে, কিন্তু তার বদলে আলোচনা আরম্ভ হল নাটকের চরিত্র নিয়ে।

স্নেহাংশু হাসল, বলল, 'নাটকটা খুবই সচ্চরিত্র। কিন্তু এতে স্ত্রী-ভূমিকা আছে, সুতরাং তোমাদের জন্যে পার্টনার দরকার। লিখে ফেলেছি বটে, কিন্তু এটা অভিনয় করা যদি সাব্যস্ত হয়, তাহলে আমরা চাইব—'

'নিশ্চয় চাইব'—মন্তব্য করে উঠল মনোজ, বলল, 'নিশ্চয় চাইব মনের মত কো-অ্যাকট্রেস।'

'তাই তো বলছিলাম,' স্নেহাংশু বলল, 'আমার নাটক সচ্চরিত্র, কিন্তু তোমরা শেষ পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকতে পারবে তো? এই নাটকে অভিনয় করার পরেও?'

মনোজ বলল, 'সেটা নির্ভর করছে ইয়ের উপর, মানে, ইয়ে আর-কি। কেমন ধরণের নায়িকা আসেন, তাঁর চেহারা কেমন, চরিত্র কেমন—এই সবের

উপর আর-কি! আমাদের নিজেদের উপর একটুও নয়।'

'ইস্, মনোজটা বলে কি!' যেন শিউরে উঠল রেবতী, বিকাশ আর অমিয়। স্নেহাংশু তো নাট্যকার, সে তো অভিনেতা নয়, তাই নিজেকে এদের দল থেকে সে একটু বুঝি আলাদা করে রাখল এবং সেইজন্যে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকতেও পারল সে।

পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখে স্নেহাংশু এমন একটা আলোড়ন তুলেছে যে, সকলেরই মনে হতে লাগল—এ একটা ভীষণ ব্যাপার। কোনো এক কালে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তখন সেই লেখককে নিয়েও বুঝি এতটা হৈ-চৈ সে-আমলের মানুষেরা করে নি। খুব হৈ-চৈ হতে লাগল বেহালার এই পল্লীতে। বেশ সাড়াই পড়ে গেল। এতদিন হয়ে এসেছে একটা জলসার পরে ছোট এক-চিলতে নাটকের অভিনয়। তখন কে সেই নাটকের লেখক, সে কথা নিয়ে মাথা কেউ ঘামায় নি; নাট্যকারকেও বিশেষ আমল দেয় নি। কিন্তু এখন তো ব্যাপার একেবারে আলাদা, সত্যিকারের নাটক বলতে যা বোঝায় তেমনি একটা ব্যাপার নিয়ে সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত হয়েছে বেহালার স্নেহাংশু বিশ্বাস।

বেহালার চৌহদ্দি পার হয়ে স্নেহাংশুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা বড় এলাকা জুড়ে। হরেশ কাজ করে মিণ্টে—সে তাদের টাঁকশালের সহ-কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল এই কীর্তিকাহিনী। দীপক হল পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী—তার মারফৎ খ্যাতি ছড়ালো তাদের আপিসে। এবং যাকে সবাই ডাকে 'ফায়ার' ব'লে সেই নীহার তাদের পল্লীর স্নেহাংশুর কথা বলতে লাগল ফায়ার ব্রিগেডের তার সহকর্মীদের কাছে। নিরীহ আর নম্রস্বভাবের মানুষ হচ্ছে বীরেন, বছর-দুই হল যোগ দিয়েছে অধ্যাপনার কাজে, সেও অধ্যাপক-মহলে বলে বেড়াতে লাগল।

অমিয় হন্তদন্ত হয়ে তাদের রিহার্সেল-রুমে ঢুকেই বলে উঠল সেদিন, 'অখ্যাত-অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী, অকস্মাৎ হয়ে উঠলে খ্যাতি-মান মূর্তিমান স্নেহাংশু বিশ্বাস?'

সকলে ঝুঁকে পড়ে নাটকটির পাণ্ডুলিপি পড়ছিল। অমিয়র গলার স্বর শুনেই তারা মাথা তুলে তাকাল, বলল, 'কি ব্যাপার?'

অমিয় বসে পড়ল মাদুরের কোণায়, বলল, 'বুকের মধ্যে চাপা একটা ব্যথা বোধ করছি। ব্যথাটা গর্বের উত্তেজনার জন্যেই কিংবা হিংসার সংকীর্ণতার জন্যে—ঠিক ধরতে পারছি নে। আমরা পড়ে রইলাম যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই; আর, আমাদের অখ্যাত-অজ্ঞাত রেখে আমাদেরই বন্ধু ঐ স্নেহাংশু একা গিয়ে দাঁড়াল ভীষণ-উজ্জ্বল আলোর মধ্যে। এতে, খুলেই

বলি, গর্ব হচ্ছে একটু-একটু, গর্ব হবারই কথা—আমাদের বন্ধু হয়ে উঠছে স্বনামধন্য। গর্ব তাই হবেই। কিন্তু হিংসেও কি একটুও হবে না?'

হিংসুক দৃষ্টিতে তাকাল রেবতী, মুখটা একটু বিকৃত করে হাসার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ছি। এতে গর্বই হবে, হিংসে হবে কেন?'

স্নেহাংশু কোনো কথা বলল না। যা নিয়ে তাদের আলোচনা হচ্ছিল, সেই বিষয় নিয়েই আবার আলোচনা আরম্ভ করল। আলোচনা হচ্ছিল চরিত্রলিপি নিয়ে। মোট তিনটি মেয়ে-চরিত্র রেখেছে স্নেহাংশু এই বিরাট নাটকে, বেশি মেয়ে-চরিত্র সে রাখে নি ইচ্ছে করেই এবং চেষ্টা করে। কিন্তু এই চরিত্র তিনটিতে নামতে রাজী আছে কে কে, এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। রেবতী মনোজ আর বিকাশ—এরা তিনজন ভারি ভূমিকার জন্য একেবারে বাঁধা। কেন না, অভিনয়ে এরা তিনজনই বেশ পোক্ত। নীহার, দীপক আর হরেশ মেয়ে সাজতে রাজী আছে কি না, এই নিয়ে কথা চলছে, তাদের রাজী করাবার চেষ্টা চলেছে। বীরেন একজন অধ্যাপক এবং তার কলেজটাও কাছেই, সে যদি মেয়ে সাজে তাহলে তার তিষ্ঠানো দায় হবে।

বিকাশ হেসে বলল, 'তাহলে ছাত্রেরা নিশ্চয় তোমাকে দিদিমণি বলে ডাকতে আরম্ভ করবে?'

নীহার নিরীহ ভঙ্গিতেই হেসে বলল, 'এটুকু সুযোগও যদি তারা কাজে না লাগায়, তবে তারা ছাত্র কিসের বলো!'

'তা বটেই।' সুতরাং মিণ্ট-কর্মী, ফায়ার-ব্রিগেডকর্মী আর পোর্টকর্মী-দের উপরই মেয়ে সাজবার দায় গিয়ে পড়ল।

এতে পৌরুষে হয়তো তাদের একটু লাগল। তারা নিশ্চল হয়েই কেবল না, নির্বাক হয়েও বসে রইল। এই নাটক নিয়ে এবং এই নাট্যকার নিয়ে তারা যেমন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলেছে তাদের সহকর্মীদের কাছে, সে উৎসাহ যেন একটু কমে আসতে লাগল তাদের। তাদের মনে হল, তাদের উপর যেন অবিচার করা হচ্ছে। অভিনয়ে তারা তেমন পোক্ত নয় বলেই তাদের মেয়ে সাজতে হবে? মেয়ে-ভূমিকায় অভিনয় করা বুঝি বেশ সোজা কাজ? তার উপর, কলেজের ছাত্রদের দৌরাত্ম্যের কথা ভেবে যদি বীরেনকে রেহাই দেওয়া হয়, তাহলে পাড়ার ছেলেদের উপদ্রবের কথা ভেবে কি তাদেরও ছেড়ে দিতে হয় না! মেয়ে সেজে একবার নামলেই পাড়ার ছেলেরা দীপককে নিশ্চয় দীপিকা বলে ডাকতে আরম্ভ করবে, নীহারকে বলবে নীহারিকা এবং হরেশকে ডাকার তেমন নাম না পেয়ে হয়তো বলবে হৃদয়েশ্বরী। এবং, এবং, এবং, পাড়ার মেয়েরা? পাড়ার মেয়েরাই বা কি বলবে? সুতরাং ওসবের মধ্যে ওরা নেই।

দীপকই প্রস্তাব করল, বলল, 'আমার একটা সাজেসশন আছে। আপিসে আপিসে যখন অভিনয় হয় তখন আপিসের কর্মিণীরাই নামে মেয়ে-ভূমিকায়। এ তো অনবরত দেখছি।'

'নামেই তো।' বিকাশ বলল, 'আমাদের ব্যাঙ্কের সব অভিনয়েই তো মেয়েরা কো-অপারেট করে। তাই কি?'

'তাই বলছিলাম।' দীপক বলল, 'এটা পাড়ার কাজ। পাড়ার কাজ মানে পাড়ার প্রত্যেকের কাজ। আমাদের এই নাটকের অভিনয়ে তবে যোগ দিক পাড়ার মেয়েরা—তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসুক লেডি-ভলাণ্টিয়ারের মত।'

সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে। কিন্তু দীপক হাসল না। তার প্রস্তাবের দাম আছে তার কাছে। ছেলেমানুষী ক'রে সে এ প্রস্তাব করে নি।

নীহার মিন-মিন করে বলল, 'কিন্তু তেমন মেয়ে কি পাড়ায় আছে হে?'

'এন্তার। এন্তার।'

'যথা—'

'মুখে রঙ মেখে তারা ইস্কুল-কলেজে সিনেমা-থিয়েটারে যেতে পারে, আর মুখে রঙ মেখে একটু স্টেজে উঠে দাঁড়াতে পারবে না? তাদের একবার বলেই দেখা যাকনা।' দীপক বলল।

দীপকের কথাটা বড় মজার—ব'লে দেখা যাক-না। কিন্তু কে গিয়ে কাকে বলবে? দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার? বাড়িতে-বাড়িতে উড়ো-চিঠি? কিভাবে কি হবে?

দীপক কাজ করে পোর্টট্রাস্টে। সে বলল, 'যত কঠিন মনে করছ, কাজটা তত কঠিন নাও হতে পারে! বড় বড় জাহাজ বাঁধা পড়ছে বন্দরে-বন্দরে, আর ক্ষুদে ক্ষুদে পল্লীবাসিনীকে রাজী করানো যাবে না—'

স্নেহাংশু বলে উঠল, 'মন্তরে মন্তরে? এই বুঝি তোমার বলার ইচ্ছে? কিন্তু সে মন্ত্র জানা নেই ভাই আমাদের। সুতরাং বিনা-মন্ত্রে যা হয় তাই হোক।'

দীপক বলল, 'তা হলে বধ করো ঐ মেয়ে তিনটি। নাটক থেকে বাদ দিয়ে দাও স্ত্রী-ভূমিকা।'

মেয়ে-ভূমিকার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে দীপকের এই প্রস্তাব শুনে সকলে চমকেই উঠল এবং সবচেয়ে বড় আঘাত পেল নাট্যকার। এত মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে স্নেহ দিয়ে প্রীতি দিয়ে এবং সেইসঙ্গে কলমের কালি দিয়ে যে নারীচরিত্রকে গড়ে তুলেছে সে, তাকেই বলা হচ্ছে তার সৃষ্ট সেই চরিত্রকে বধ করতে?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল স্নেহাংশু, দুই হাত তার পাণ্ডুলিপির উপর

রেখে সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। যারা তাকে খ্যাত ক'রে তুলেছে তারাই যেন চক্রান্ত করে তার সর্বাঙ্গ থেকে তার খ্যাতির সমস্ত আবরণ কেড়ে নিয়ে তাকে রিক্ত নিঃস্ব ও দেউলিয়া করে দেবার জন্যে উদ্যত হয়েছে, এমনই মনে হল অকস্মাৎ স্নেহাংশু বিশ্বাসের।

পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো গুছোতে-গুছোতে অস্ফুটে সে বলল, 'থাক্।'

আর অভিনয়ের দরকার নেই, তার যেন শিক্ষা হয়ে গিয়েছে খুবই, এমনই অবস্থা হয়ে গেল স্নেহাংশুর।

অমিয় একটু এগিয়ে বসে একটু বুঝি সান্ত্বনার সুরেই বলল, 'কি হল হে? হঠাৎ অমন ইয়ে হয়ে গেলে কেন?'

স্নেহাংশুর যেন আর উৎসাহ নেই, সে আবার বলল, 'থাক্।'

'নিশ্চয়।' অমিয় বলল, 'থাকবে বই-কি। তুমি যা লিখেছ তার সব থাকবে। পুরুষ-চরিত্রগুলোও যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে মেয়ে-চরিত্রও। দীপকের কথায় কিছু মনে কোরো না।'

দীপক বুঝি একটু লজ্জিত হয়েছে। তাই একেবারে চুপ করে বসে আছে।

রেবতী, বিকাশ আর মনোজ কেবল এই পাড়াতেই অভিনয় করে না, তারা ব্যাঙ্কের কর্মী। তাদের আপিসের অভিনয়েও শক্ত ভূমিকাগুলি তাদের জন্যে বাঁধা। মেয়ে-ভূমিকায় সে অভিনয়ে নামে মেয়েরাই। মেয়েদের সঙ্গে অভিনয়ের অভ্যাস তাদের আছে। এটা কেবল পাড়ার ব্যাপার বলে তারা এর মধ্যে সত্যিকারের মেয়ে আনতে একটু দ্বিধা করছিল। কিন্তু দীপকরা যদি অত ছেলেমানুষ হয়, মেয়ে-সাজার নাম করলেই তাদের ইজ্জতে যদি লাগে, তবে থাক্ তারা তাদের ইজ্জৎ নিয়ে। স্নেহাংশুর নাটকের জন্য অন্য ব্যবস্থা তা হলে করতেই হবে।

গম্ভীর হয়ে বসে ছিল বিকাশ। এতক্ষণে সে বলল, 'ভেবো না। ব্যবস্থা একটা হবেই!'

আশ্বাসের কথাই বলল বিকাশ, কিন্তু তার কথা শুনে স্নেহাংশুর মনে হল সে যেন কত ছোট হয়ে গিয়েছে। এই রিহার্সেল-রুমে যখন সে এসে আজ বসেছিল, তখন তার মনে কত জোর, তখন তার সর্বাঙ্গে খ্যাতিব একটা শিহরণ লেগে আছে; তখন তার মনে হয়েছিল, সত্যিই তার মনে হয়েছিল, এদের সকলের থেকে সে কত আলাদা এবং কত বড়। কিন্তু হঠাৎ তার সেই গোপন অহমিকা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সে যেন এদের কৃপার কণার উপর নির্ভর করছে এখন।

স্নেহাংশু বড় সেণ্টিমেণ্টাল জীব এবং খুব সেন্সিটিভ, সে চুপ করে

বসে-বসে ভাবছে, ভাবতে-ভাবতে আবার সে বলল, 'থাক্।'

অমিয় বলল, 'সেই ভালো। থাক্। এসব নিয়ে আজ আর কথা না। আজ এই পর্যন্তই।'

দীপকও বেশ একটু মর্মাহত। নাটকটার সর্বনাশ করার ইচ্ছে তার এতটুকুও নয়। একটু তামাসা করার ইচ্ছে তার ছিল এবং সেইসঙ্গে নিজেদের নির্ভেজাল পুরুষ বলে জাহির করার ইচ্ছেও। কিন্তু কথায়-কথায় আবহাওয়াটা বড় জটিল হয়ে যাওয়ায় সে লজ্জিত ও আহত হল মর্মে-মর্মে।

ঘরের এই মেঘলা আবহাওয়াটা সাফ করে দেবার জন্যে হঠাৎ হেসে উঠল দীপক, বলল, 'এতক্ষণ একটা নাটক করলাম। আসলে আমি রাজী—মেয়ে হোক পুরুষ হোক, যে-ভূমিকা আমাকে মানাবে, আমি তাই নিতে রাজী আছি।'

নতমাথাটা একটু তুলে স্নেহাংশু তাকাল দীপকের দিকে।

দীপক বলল, 'আমি একা না, হরেশ রাজী, নীহার রাজী—তাদের হয়েও আমি ঘোষণা করলাম। যা থাকে বরাতে—পাড়ায় যদি এজন্যে দীপিকা হয়ে যাই, হলাম!'

নীহার বলল, 'এই বেশ। সবে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ। সুতরাং লজ্জার আছে কি? না হয় বললই লোকে নীহারিকা!'

খুশি-খুশি হয়ে উঠল আবহাওয়া। মনোজ চারদিকে চেয়ে নিয়ে হরেশের দিকে চেয়ে বলল, 'আর তুমি? তুমি কোনো কথা বলছ না কেন হে, হরেশ।'

হরেশ হাসল, বলল, 'হৃদয়েশ্বরী হতে কেমন-যেন সংকোচ হচ্ছে। আজ পর্যন্ত কাউকে করতে পারলাম না ঐ জিনিসটা, অবশেষে নিজেকেই করে তুলব—'

'নইলে নাটক জমবে কেন।' অমিয় বলল, 'অবশ্য যদিও ইতিমধ্যেই বেশ জমাট হয়ে জমে উঠেছে আমাদের নাটক—কি যেন নামটা আমাদের নাটকের?'

মনোজ বলল, 'অচিনপুরী।'

স্নেহাংশুর মনের গুমোট একেবারে কেটে গিয়েছে। তার মুখে একটু হাসিই যেন ফুটে উঠেছে। সে বলল, 'নামটা তোমাদের সকলের পছন্দ তো ভাই?'

দীপক বলল, 'অভিনয় করতে নেমে আমাদের যদি নাম বদল হয়ে যায়, তোমার নাটকেরও নাম দরকার হলে বদল কেন হবে না ভাই?'

অমিয় চোখ রাঙিয়ে বলল, 'এই! আবার?'

দীপক কোনো কথা বলল না। কিন্তু মনে-মনে হাসতে লাগল।

আজকের আসরটা একেবারে মাঠে-মারা গেলই বলতে হবে। কোনো

কাজের কাজই আজ হল না। কথা ছিল—মোটামুটিভাবে আজ নাটকের ভূমিকাগুলি সকলের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে। সে কাজটা করবে স্নেহাংশু, কেন না, চরিত্রগুলি সবই তার চেনা। তারপর নাটকটা আজ পড়া হবে, প্রত্যেকেই যাতে নিজের নিজের চরিত্রের সংগে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকা নিয়ে প্রত্যেকের এত ভূমিকা শুনতে-শুনতে সময়ই কেটে গেল অনেক।

আজকের এই অভিজ্ঞতাটা সকলের কাছেই তেতো ঠেকল। উদ্বোধনের দিনেই এ-রকম অশোভন আচরণ বিশেষ করে তিক্ত লেগেছে স্নেহাংশুর। সে তাই যেন কারও কোনো কথার উপরেই ভরসা রাখতে পারছে না।

তার তাই ইচ্ছে হচ্ছে, নাটকটার কেবল নাম-বদলই না, সে এর আগা-গোড়া সব বদলে দিয়ে যা রয়-সয় এমন-একটা নাটকই নতুন করে লিখে ফেলবে।

অমিয় স্নেহাংশুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কি ভাবছ হে নাট্যকার? নতুন কোনো নাটকের প্লট বুঝি?'

অমিয়র কথা শুনে একটু যেন চমকেই উঠল স্নেহাংশু। অমিয় কি তা হলে তার মনের কথাটা ধরে ফেলতে পেরেছে?

স্নেহাংশু এবার একটু স্পষ্ট করেই বলল তার ইচ্ছের কথাটা। বলল, 'তাই-ই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, অনেকগুলি নাটকই তো লিখলাম, সেগুলোর অভিনয়ও হল। কিন্তু সে-সব নিয়ে এত কথা হয় নি। কিন্তু এটা নিয়ে মনে হচ্ছে, এর অভিনয় বুঝি করা যাবে না। সূচনাতেই যখন এত আপত্তি, তখন থাক্ এটা। আমি মেয়ে-চরিত্রগুলি বাদ দিয়ে নতুন ক'রে—'

বাধা দিয়ে উঠল প্রথমেই দীপক, বলল, 'উঁহুঁ। তা হয় না। এই নাটকই হবে। হতেই হবে। এবং আমাদের উপর যে আদেশ হবে আমরা তা পালন করব। কি বলো হে হরেশ। কি বলো নীহার?'

ওরা দুজনে সম্মতি জানাল।

তবু যেন সব রফা হয়ে গেল না। বিকাশের দিকে চেয়ে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগল মনোজ।

মনোজ ইতিমধ্যে মন স্থির করে ফেলেছে। ওসব সাতে-পাঁচে সে নেই। কারও উপরে নির্ভর করা আর না। কারও করুণার উপর আর আস্থা রাখতে রাজী না সে।

মনোজ বলল, 'আমি ঠিক করব।'

অমিয় জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

মনোজ বলল, 'আমাদের পার্টনার। সত্যিকার মেয়ে-অভিনেতা অনেক আছে এই কলকাতা শহরে। কোনো পুরুষকেও মেয়ে সাজতে হবে না, পাড়া থেকেও লেডি-ভলান্টিয়ার খুঁজতে হবে না।'

একটু উল্লসিতই হল স্নেহাংশু। তার চোখে জেগে উঠল স্বপ্ন। ট্রেনে যেতে-যেতে সে দেখেছিল—রেল লাইনের থেকে কিছু তফাতে একটা মাঠের মধ্যে বিরাট একটা পুরনো বাড়ি, জীর্ণ হয়ে গিয়েছে সেই বাড়িটা, তার দেয়ালে আর ছাদে গজিয়েছে আগাছা, একেবারে পরিত্যক্ত বলে মনে হয়েছিল তার সেই বাড়িটাকে, হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাড়িটার দোতলার একটা জানলায়। দেখল, একটি মেয়ে সেই জানলায় দাঁড়িয়ে আছে একা। বেশিক্ষণ সে দেখতে পায় নি এ-দৃশ্য—তীব্রবেগে ছুটে চলে গেল ট্রেন। উহ্য হয়ে গেল সেই অচিনপুরীটা।

বাড়িটা সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথা ভেবেছে সে একা-একা। অনেক কথা সে ভেবেছে ঐ এক-লহমার দেখা মেয়েটি সম্বন্ধে। এবং ভাবতে-ভাবতে নিজের মন-গড়া একটা কাহিনী খাড়া করে গড়ে তুলেছে এই নাটক।

মনোজ যদি খুঁজে নিয়ে আসে অন্তত একজন অচেনা মহিলাকে, তা হলে তারই মধ্যে স্নেহাংশু বুঝি পেয়ে যাবে তার স্বপ্নের নায়িকাকে। স্নেহাংশুর শরীরে একটু যেন শিহরণ দেখা দিল। মনোজের দিকে ঝুঁকে সে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে সেই মেয়ে?'

'আছে। আছে।'

'কি নাম তার?'

মনোজ বলল, 'যার কথা ভাবছি, যদি তাকে পাই তবে তো?'

'তা তো বটেই। তার নাম কি?'

মনোজ বলল, 'দিবা।'

বিকাশ আর রেবতী একটু নড়ে বসল। তারাও চেনে এই মেয়েকে। তাদের ব্যাঙ্কের কর্মীরা অভিনয় করেছিল মাইকেল মধুসূদন, ঐ মেয়েটা তাতে অভিনয় করে হেনরিয়েটা—আঁরিয়াতা।

বিকাশ মন্তব্য করল, 'বড় দর। বড় ডাঁট।'

দিবার নাম ঘোষণা করা মাত্র এই রাত্রিবেলাও যেন এই ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের আলো উহ্য করে দিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করল দিবালোক।

সেই আলোর তেজে যেন নিভে গেল দীপকদের দীপ্তি, সেই আলোয় ডবল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল স্নেহাংশুর উৎসাহ।

আরও দুটি মেয়ের দরকার। কিন্তু সেকথা নিয়ে এখন আর কথা হল

না। নায়িকা-নির্বাচনই যদি হয়ে গেল তখন কাজ তো হয়ে গেল অর্ধেকের উপর। ওসব ছোটখাট ভূমিকার জন্যে এখন ভেবে লাভ নেই।

অমিয় কেবল বলল, 'রিহার্সেলের জন্যে তা হলে একটা ভালো জায়গা দেখতে হয়। মেয়েদের নিয়ে এখানে হৈ-হল্লা করলে বাবা-মা রাগ করবেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আশ্বাস দিল মনোজ।

॥ দুই ॥

অচিনপুরীর রিহার্সেল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অমিয়দের বাড়িতে রিহার্সেল হচ্ছে না। এর জন্যে নতুন জায়গা জোগাড় করা হয়েছে। বেহালা থেকে জায়গাটা কিছুটা দূরে—মোমিনপুরে।

বড় রাস্তা থেকে কিছুটা ভিতরে বেশ নিরিবিলি জায়গা, ঘরটাও বেশ বড়। নাটকের রিহার্সেলের পক্ষে যেমন উপযুক্ত, পরিবেশটাও যেন তেমনি নাটকীয়। এখানে এসে বসলেই যেন ঠিক স্বাভাবিক থাকতে ইচ্ছে করে না, একটু নাটুকে ভঙ্গিতে চলতে ও বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু, মনে হয়, কেবল পরিবেশটার জন্যেই সকলের মনের ভাবটা এরকম হয় নি, এরকম হবার অন্য কারণও অবশ্যই আছে।

কারণটা আর-কিছু না। এখানে তারা সত্যিকারের অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করতে পারবে, এই সম্ভাবনাটাই অসম্ভব রকম ভাবে তাদের উত্তেজিত করে রেখেছে। এতদিন তারা অভিনয় করেছে নিজেদের বন্ধুর সঙ্গে। তার বেশি কিছু না। কিন্তু এবার তাদের জীবনে আসছে বুঝি নতুন অভিজ্ঞতা।

যে নায়িকার জন্যে তারা এমন উৎকণ্ঠিত, তার আবির্ভাব ঘটবে কবে—এই জিজ্ঞাসা সকলেরই মনের মধ্যে চাপা আছে, কিন্তু কেউই তা প্রকাশ করছে না। সকলেরই ভাবটা এমন, যেন তারা স্নেহাংশুর এই নতুন নাটকে অভিনয় করার জন্যেই ব্যাকুল।

মনোজ, রেবতী বা বিকাশ ততটা চঞ্চল না, যতটা চঞ্চল আর-সকলে। কেন না, ওরা তিনজনেই চেনে সেই নায়িকাকে—দিবা দেবীকে। কিন্তু ওরা কয়েকজন? হরেশ, দীপক, নীহার আর অধ্যাপক বীরেন? ওরা কখনো দেখে নি সেই নায়িকাকে। মনে মনে তাই তাদের অনেক জল্পনা ও অনেক কল্পনা। চোখে তাই তাদের লেগে আছে—

কিন্তু সে কথা থাক। ওরা রিহার্সেল দিয়ে চলেছে। বড় বই, ভূমিকাও অনেকগুলি। পার্ট বেঁটে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়ে নিজেকে জাহির করার জন্যে ব্যস্ত।

এদের এই উৎসাহ দেখে সবচেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে যে, সে স্নেহাংশু। গর্বে তার বুক যেন ফুলে উঠছে। তার ভাবতেই বড় ভালো লাগছে যে, এতগুলো চরিত্র সে সত্যি এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

ওরা যখন সংলাপগুলি বলছে, তখন স্নেহাংশুর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। তার মনে হচ্ছে—এত সুন্দর ও লাগসই কথা তার কলম দিয়ে বেরলো কি ক'রে! তার চোখদুটো উদাস হয়ে উঠল, মন ভরে উঠতে লাগল প্রসন্নতায়। তার মুখের চেহারাটা বেশ মনোরম হয়ে উঠল এতে, বেশ ভাবুক আর বেশ কবি-কবি দেখাতে লাগল স্নেহাংশুকে।

স্নেহাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অমিয় বলল, 'বা, সুন্দর দেখাচ্ছে বটে আমাদের নাট্যকারকে। চোখ দুটিতে যেন যাদু লেগে আছে।'

দীপক বলল, 'হুঁ। যাদুই বটে। স্বপ্নও বলা যায়—দিবাস্বপ্ন।'

'কী বললে, দীপক?' প্রায় হুংকার দিয়ে উঠল যেন মনোজ।

অধ্যাপক বীরেন নিরীহ গলায় বলল, 'দিবাস্বপ্ন।'

সকলে হেসে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। অভিনেত্রীটিকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছে মনোজ। অতএব সে-ই তার অভিভাবক-বিশেষ। সুতরাং সেই অভিনেত্রীর নাম নিয়ে কোনোরকম তামাসা মনোজ পছন্দ নাও করতে পারে —এই কথা ভেবে সকলে চুপ করে যাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু মৌচাকে ঢিল পড়লে মৌমাছিদের ঠান্ডা করতে একটু সময় লাগে, তাদের গুঞ্জনও চট করে থামতে চায় না।

কথাটা তো মন্দ বলে নি দীপক। পোর্টট্রাস্টে কেরানিগিরি করেও তার মনে রস তবে কিছু আছে। জাহাজের কারবার করা সত্ত্বেও আদার খবরও কিছু রাখে তা হলে!

গলাটা সাফ করে নেবার চেষ্টা করল নীহার, একটু কাশল, সকলেই আশা করল নিরীহ নীহার এবার কিছু বিরহ অথবা বিহার প্রসঙ্গ তুলল বুঝি। কিন্তু সকলকে হতাশ করে দিয়ে নীহার সংক্ষেপে বলল, 'ছি!'

নীহারের এই মন্তব্যটা শুনে হরেশ সকলের মুখের দিকে তাকাল, সকলের মনোভাবটা যাচাই করার লোভ হল তার। তার ইচ্ছে হল একটু ঝুন দিয়ে দেখা যাক নীহারটা মেকি, না, সাচ্চা।

হরেশ বলল, 'ঠিক। একজন অপরিচিতা মহিলাকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করা উচিত না। বিশেষ করে যিনি এখানে আসছেন অতিথিরূপে, আমাদের গেস্ট হয়ে। আর, আর, আর—যাঁকে এখানে আনা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না, যদি না আমাদের মধ্যে থাকত মনোজ। কোনোরকম হাসি-ঠাট্টা করার আগে—এ-কথাটা আমাদের ভাবা দরকার।'

মনোজ যেন ডুবে ছিল নাটকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে, বসে-বসে পাতা ওল্টাচ্ছিল। এবার সে সেই পাতা থেকে মাথা তুলে একটু যেন চোখ উল্টেই বলল, 'ঘটে বুদ্ধি তবে আছে দেখছি।'

সময়ের মধ্যেই নিজেকে তৈরি করে নেবার যোগ্যতাও অর্জন করে নিতে পেরেছে সে। মনোজকে তাই সে বলেছে, 'আপনারা এগিয়ে যান, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে আপনাদের ধরে নেব।'

সুতরাং এর পরে আর পিছিয়ে আসা যায় না। তার উপর এই অচিন-পুরীর নায়িকা হবে দিবা এবং এর নায়কের ভূমিকায় নামছে মনোজ।

এ-সব কারণে কথা বলতে হল মনোজকেই। মনোজ একটু হেসে, হাওয়াটা হাল্কা করে দেওয়ার চেষ্টা ক'রে, বলল, 'দীপকটা বড্ড ছেলেমানুষ! নিজেরা একটু রসিকতা করব না? আলবৎ করব। তাতে যদি কারও গায়ে ফোস্কা ওঠে, উঠুক। আমাদের দিবা দেবী হবেন আমাদের নায়িকা।'

বা, বা, বা! সুন্দর কথা বলেছে তো মনোজ। এমন পরিষ্কারভাবে কথা বলে সব একাকার করে দিল সে। এ ক'দিন মনোজের আচরণ দেখে সকলেরই কেমন মনে হয়েছিল যে, মনোজ একেবারে যেন করতলগত করে রাখতে চাচ্ছে ঐ নায়িকাকে, যেন ঐ নায়িকা একমাত্র মনোজেরই করতলগত, তার উপরে আর যেন কারোই কোনো অধিকার নেই। তার উপর মনোজের হাব-ভাব দেখে ও কথা বলার ভঙ্গি দেখে বন্ধুরা সকলেই মনে করছিল যে, মনোজ যেন অমন-একটা নায়িকা সংগ্রহ করে এনে দিয়ে তাদের সকলকে ধন্য করে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, এ নায়িকা উত্তম নায়িকা, এ নায়িকা উৎকৃষ্ট নায়িকা—এ কথা তারা স্বীকার করে। সকলেই তাকে চাক্ষুষ দেখেছে, কিম্বা সকলেই তার অভিনয় দেখেছে---এমন নয়। যারা দেখেছে তারা তো দেখেছেই, যারা দেখে নি তারা এর অভিনয়ের ও অন্যান্য বিষয়ের তারিফ শুনেছে অনেক। সেই নায়িকা এসে তাদের সঙ্গে অভিনয় করবে—এটা আনন্দের কথা, কিন্তু ভাগ্যের কথা এটা কখনোই নয়। কেন না, তিনি অসূর্যম্পশ্যাও নন, অস্পৃশ্যাও নন।—অস্পৃশ্যা কথাটার মধ্যে অবশ্য রস ও একটু রসিকতা আছে।

যাই হোক, মনোজ যে একটু রাশ আলগা দিয়েছে এবং ঐ নায়িকাকে সকলের নায়িকা বলে ঘোষণা করেছে—এইটেই আশ্বাসের কথা. ভরসার কথাও।

সকলে একটু শক্ত হয়ে ব'সে ছিল, সকলে এবার গা একটু আলগা দিয়ে বসল।

দীপক বলল, 'এইরকম কথাই শুনতে চেয়েছিলাম। দিবা দেবী হবেন আমাদের নায়িকা—ঠিক বলেছ ব্রাদার মনোজ। তিনি আমাদের সকলের নায়িকা, অর্থাৎ আমাদের নাটকের তিনি নায়িকা।'

একটু নড়ে বসল স্নেহাংশু, তার নাটকের উল্লেখ শুনে একটু বুঝি

খুশিই হল সে, বলল, 'রিহার্সেলটা এবার একটু চেপে দিতে হবে। কেউ যেন গা লাগিয়ে—'

হরেশ হেসে উঠল, বলল, 'সব যখন রফা হয়ে গেল, তখন আর কথা নেই। গা লাগাবে এবার সবাই, কত গা চাই?' ব'লেই সে সুর ধরল, 'সা-রে-গা, মা-রে-গা, পা-রে-গা—'

সকলে বাধা দেওয়ায় থেমে গেল হরেশ। কিন্তু বেশিক্ষণ থেমে থাকল না, আবার বলল, 'বিষাদে হরিশ। এই তো চাই। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। মনোমালিন্যে কোনো সুফল ফলে না, ঐক্যেই বল। বলো, দিবা দেবী কি—'

নীহার বলে উঠল, 'জয় বলব না। যদি বলি, তবে সেটা বাংলা জয় নয়, ইংরেজি জয়। আমরা আনন্দিত, আমরা পুলকিত, আমরা রোমাঞ্চিত, আমরা—'

প্রাণ খুলে হেসে উঠল সকলে একসঙ্গে। নীহারের উক্তিটা হচ্ছে স্নেহাংশুর একটি একাঙ্কিককার একটি ডায়ালগ।

সকলের মন খোলসা হয়ে গিয়েছে। এইবার নাটক বুঝি তবে জমবে।

নাটক তো জমবে। এদিকে সকলের অজানিতে রাতও তো বেশ জমে উঠেছে। ঠাণ্ডাও তো পড়েছে বেশ। ঘরের মধ্যেই অবশ্য বসে আছে সকলে, কিন্তু বাইরের হিমহাওয়া ঘরে ঢোকার মত ছোট-বড় রাস্তা আছে অনেকই। জানলা-দরজাও অনেক। কিন্তু সেগুলো বন্ধ করে দিলেও বন্ধ হয় না, পুরনো কাঠের ফাঁক দিয়ে প্রচুর হাওয়া খেলে। অনেকগুলো জানলার খড়খড়ি আবার ভাঙা। সুতরাং বাইরে ঠাণ্ডা যতটা পড়েছে, ভিতরের ঠাণ্ডা তার চেয়ে খুব কম নয়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বোঝা যায় নি, কেন না তখন ঘরের আবহাওয়াটা অনেকের মেজাজের তাপেই উষ্ণ হয়ে ছিল। কিন্তু মেজাজ যখন এখন সকলের ঠাণ্ডা, তখন, হ্যাঁ, ঠাণ্ডাটা এখন যেন গায়েও লাগছে একটু।

এখান থেকে বেরিয়ে আবার ধরতে হবে বাস কিংবা ট্রাম। তারপর এই মোমিনপুর থেকে যেতে হবে সেই বেহালায়, সেই রায়বাহাদুর রোডে।

অমিয় উঠে দাঁড়াল। আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে হাত-ঘড়িটা দেখে নিল একটু ঝুঁকে, বলল, 'উঃ, এত রাত হয়ে গেল নাকি?'

'ক-টা এখন?'

'পৌনে এগারো।'

ওরা বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগাতে লাগল অমিয়।

এই বারান্দায় বসে যারা বিড়ি বানায়, তারা এখন কেউ নেই। কিন্তু

রাস্তার কয়েকজন ভিখিরি এখানে এসে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুম জুড়ে দিয়েছে।

রিহার্সেল দেওয়ার আস্তানাটা তাদের ভালোই হয়েছে। নাটকটার যা পরিবেশ, এই বাড়িটার পরিবেশের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে। নাটকের যে নায়িকা সে হচ্ছে এক পুরনো বাড়ির বাসিন্দা, এই নাটকে অভিনয় করতে আসবেন যে নায়িকা, তিনি পরিবেশটা পাবেন ভালোই।

বেহালার যাত্রীরা গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ডায়মণ্ডহারবার রোডে এসে দাঁড়াল। একচাপ অন্ধকারের মত দেখতে লাগল তাদের। তাদের বুকে এবার যেন বল এসে গিয়েছে, তাদের মনে উৎসাহও দেখা দিয়েছে যেন চতুর্গুণ। একটা চাপা দ্বিধা এবং একটা ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব তাদের মনের মধ্যেই জমে উঠেছিল। আজকের আলোচনার পর সেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গিয়েছে একেবারেই। তাদের মনের অন্ধকারও আর নেই। সেইসব অন্ধকার তাদের মন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের এই শীতার্ত কুয়াশায় মিশে গিয়ে ডায়মণ্ড-হারবার রোডের ধারের আলোর সঙ্গে যেন দ্বন্দ্ব জুড়ে দিয়েছে।

আলোয়ান দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিয়েছে তারা, কিন্তু তাদের মুখ চলছে, কথা চলছে। কথা চলেছে নাটক নিয়ে, কথা চলেছে নাটকের ভূমিকা-লিপি নিয়ে। তাদের মন অনেক পরিষ্কার হয়েছে, তাদের কথায় আর ক্ষোভ নেই, শ্লেষ নেই, উত্তাপ নেই। নাটকটির অভিনয়, যাকে বলে সাফল্যমণ্ডিত করা, তাই করার দিকেই তাদের প্রত্যেকের সমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যেন তাদের কথায়বার্তায়।

এদের এইসব কথা শুনে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে স্নেহাংশু। মন ভরে যাচ্ছে আনন্দে।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চলেছে। ট্রাম বা বাস নেবার গরজও তাদের নেই। এর মধ্যে কোনো ট্রাম-বাস তাদের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে কি না, সেদিকে বুঝি লক্ষ্যও তারা দেয় নি।

তারা উঠে এল মাঝেরহাট ব্রীজের উপর। ব্রীজের নীচ দিয়ে প্রবল শব্দ করতে-করতে চলে গেল একটা মালগাড়ি।

স্নেহাংশুর মনের কবিতা অমনি বুঝি গর্জে উঠল, থমকে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'ঐ গার্ডসায়েবকে নিয়েও লিখতে হবে একটা নাটক। কিরকম নিঃসঙ্গ, কিরকম অসহায়, কিরকম নির্জীব ঐ মানুষটা। জনপ্রাণীহীন লম্বা দুটা গাড়ির পালের পিছনে একা একটি মানুষ বসে আছে। করা যায় না চবে সাবজেক্ট নিয়ে একটা নাটক?'

তা যাবে না কেন?' অমিয় বলল, 'কিন্তু ওই একক-জীবনের ঘাত-

প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না-হয় দেখাবে বক্তৃতা দিয়ে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'বলছিলাম নায়িকার কথা। মালগাড়ির গার্ডের নায়িকা পাবে কোথায়?'

হেসে উঠল সকলেই, স্নেহাংশুও হাসল। বলল, 'নাটকটা কি কেবল ঐ গার্ডের কামরার মধ্যেই আটক থাকবে? কামরা থেকে একবারও কি সে নামবে না, একবারও কি সে বেরিয়ে আসবে না। দৃশ্য-বদল করে নিলেই সব ইচ্ছা পূরণ করে নেওয়া যাবে।'

ব্রীজের ঢালু পথ দিয়ে দ্রুত নামতে-নামতে অমিয় বলল, 'তা হলে সকলকে নিয়েই নাটক হয়। ঐ গার্ড বেচারা তা হলে একা কি দোষ করল। আমাদের জীবন নিয়েও নাটক হয়, নানারকম অবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলে-ফেলে নাট্যকার তাঁর কার্যসিদ্ধি করতে পারেন।'

'তা পারা যায় বটে।' স্নেহাংশু বলল, 'কিন্তু কথাটা তা নয়। কথা হচ্ছে, ঐ নিঃসঙ্গ প্রাণীটির জীবনের ট্র্যাজিডি নিয়ে। যাই বলো, আমার একটু সিম্প্যাথি আছে ওদের উপর।'

হরেশের কর্মক্ষেত্র ঐ মিণ্ট। ডাইনে টাঁকশালের প্রকাণ্ড বাড়িটা রেখে ওরা হেঁটে চলেছে।

হরেশ হাসতে-হাসতে বলল, 'অ্যালোপাথি আর হোমিওপ্যাথি এই দু-রকম দাওয়াইয়ের কথাই তা বেশি শুনি। কবিরাজির কথাও অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু আমাদের কবির দাওয়াই বুঝি সিম্প্যাথি?'

একটু বিরক্তই হল যেন স্নেহাংশু। থমকে থেমে গেল সে, বলল, 'আর হাঁটা যায় না। এবার রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলো। ট্রাম নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটা বাস ধরতে হবে।'

প্রস্তাব শোনার অপেক্ষাতেই যেন ছিল সকলে। প্রস্তাবটা করা মাত্র সকলে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তাদের চাহিদা-মত তখনই একটা বাস এসে হাজির হবে, এতটা আশা করা যায় না। ওরা রাস্তা পার হয়ে ওপার ধরে হেঁটে চলল, বাস এলেই সকলে দল বেঁধে হাত তুলে বাস দাঁড় করাবে—এই তাদের ইচ্ছে।

হরেশের মন্তব্যের জবাব দেওয়া হয় নি।-ও-কথার খেই ধরে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করল না স্নেহাংশু। কিন্তু অমিয় বলল কথা। বলল, 'সিম্প্যা ইজ দি থিং। ওটি না থাকলে কিছুই থাকল না। পোড়োবাড়ি আমরা কি দেখি নি কখনো? ওরকম কোনো বাড়িতে কি দেখি নি কখনো নিঃস কোনো প্রাণী? মেয়ে হোক, পুরুষ হোক—দেখি নি কি কোনো মানুষ- নিশ্চয় দেখেছি। কিন্তু দেখেই আমরা খালাশ। কিন্তু স্নেহাংশু? স্নেহাংশু

কি না সেই মুহূর্তের দেখার উপর ভর করে খাড়া করে তুলল একটা নাটক। যাকে দেখেছে স্নেহাংশু তার উপর নিশ্চয় তার একটা ইয়ে হয়েইছে—কি বলো স্নেহাংশু।'

স্নেহাংশু কিছু বলল না। কিন্তু অমিয়র কথা শুনে তার চোখের সামনে নতুন করে জেগে উঠল সেই বাড়িটা, চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ছবিটা, একটা ছোট শাখানদী বয়ে যাচ্ছে বাড়িটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে, পুরো বাড়ির ছায়া এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ নদীর জলের উপর। স্নেহাংশু যদি ছবি আঁকতে জানত তাহলে এই দৃশ্যের একটা ছবিই সে আঁকত, এতটা মেহনত ক'রে এতবড় একটা নাটক সে লিখতই না।

বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপেছিল স্নেহাংশু, সে যাচ্ছিল ডায়মণ্ড-হারবারে। কোনো কাজে যাচ্ছিল না, যাচ্ছিল একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে। মন তাই ছিল খালি ও খোলা। জানলায় বসে সে দেখতে-দেখতে চলেছিল দু-পাশের ঘরবাড়ি, দু-পাশের মাঠ-ঘাট, ও দু-পাশের প্রান্তর। যাদবপুর গড়িয়া সোনারপুর ছাড়ার পরেই রেল লাইনের কাছাকাছি লোকালয়ের সংখ্যা কমে আসতে লাগল, ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল উন্মুক্ত মাঠ ও প্রান্তর। বড় মজা লাগছিল স্নেহাংশুর। শহরের বাইরে বড়-একটা যাওয়া হয় না; কিন্তু শহরের এত কাছেই যে এমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছড়ানো আছে—একথা তার বুঝি জানা ছিল না। মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল স্নেহাংশুর, তার মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে লাগল, জেগে উঠতে লাগল অনেক স্বপ্ন ও অনেক কল্পনা।

দু-পাশে প্রশস্ত প্রান্তর ছড়াতে-ছড়াতে যেন এগিয়ে চলেছে তার ট্রেন। তার কামরায় যাত্রী বেশি ছিল না ব'লে আরও বেশি মজা লাগতে লাগল তার। চোখ-দুটোকে যেমন ইচ্ছে-মত খেলাতে পারছে, মনও তেমনি ইচ্ছে-মত নড়ে-চড়ে বেড়াতে পারছে। হঠাৎ কখনো-কখনো সাঁকোতে উঠে উঠে পড়ছে ট্রেন, সুর বদল করে আবার ছুটে চলেছে ডাঙা-পথ ধরে। মাঝে মাঝে সেই প্রান্তর ভেদ করে জেগে উঠছে গ্রাম, দেখা দিচ্ছে স্টেশন। একটু দম নিয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করছে ট্রেন।

একা-একা এ রকম বেড়ানোর মধ্যে বেশ মজা আছে তো! খুব ফুর্তি বোধ হচ্ছে স্নেহাংশুর। মনে-মনে সে গান করছে, হয়তো সে গান তার নিজেরই বাঁধা, হয় তো সে গান আছে তার কোনো একাঙ্ক নাটকে। হাঁটু-দুটো কোলের মধ্যে নিয়ে দৃষ্টিটা বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে পরম-আনন্দে ভ্রমণে চলেছে স্নেহাংশু বিশ্বাস।

ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে সে দেখবে জল—জলের অরণ্য! সারাদিন সে

নদীর কিনার-বরাবর ঘুরে বেড়াবে উদ্দেশ্যহীনভাবে। লেখায় যখন হাত সে দিয়েছে তখন লেখার মসলা তাকে জোগাড় করতে তো হবেই; কোনো উপকরণ খুঁজে না নিলে—

হঠাৎ যেন চমকে উঠল স্নেহাংশু। দু-পাশে লোকালয়হীন এই প্রান্তর। তার মাঝে ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটা কাদের? রেল-লাইন থেকে খুব বেশি দূরে না, ট্রেন আরও এগিয়ে এলে সে তাকাল বাড়িটার দিকে। এবার আরও চমক লাগল স্নেহাংশুর। বিরাট প্রান্তরের এক পাশে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ যে বাড়িটা, তার দোতলার জানলায় মূর্তিটি কার? পরিচ্ছন্ন একটি মেয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে ঐ জানলায় এই ট্রেনের দিকে মুখ ক'রে। সুর বদল করে একটা ছোট সাঁকোয় উঠে পড়ল গাড়ি। স্নেহাংশুর মনের সুরও যেন বদলে গেল। সে ঝুঁকে তাকাতে লাগল বাড়িটার দিকে। কিন্তু ট্রেনের গতি কমল না। স্নেহাংশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার নিজের গতিতেই ছুটে চলল সেই গাড়ি।

বড়ই জীর্ণ ঐ বাড়িটা। অজস্র গাছ ঘিরে ধরে আছে বাড়িটাকে। তার চারদিকে প্রাচীর। কিন্তু নোনা ধরে অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে প্রাচীরটা। বাড়ির গা দিয়ে চলে গিয়েছে একটা ছোট জলের ধারা। যে সাঁকোটা এইমাত্র পেরিয়ে এল স্নেহাংশু সেটা বোধ হয় ঐ জলের ধারাটা পার হবার জন্যই তৈরি।

এই লোকালয়হীন নির্জন-নির্জীব-নিঃসঙ্গ এলাকায় কার ঐ বাড়ি? কে থাকে ওখানে? কাকে সে দেখে এল ঐ জানলায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে?

কিছু ভেবে পেল না স্নেহাংশু। কিন্তু সে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার ভাবনায় বাধা দিয়ে ব্রেক কষল ট্রেন। ডায়মণ্ডহারবার।

স্নেহাংশুর সব পরিকল্পনা বুঝি মাঠে মারা গেল। ঐ মাঠেই বুঝি মারা গেল তার পরিকল্পনা, যেখানে একা-একা দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদতুল্য ঐ জীর্ণ অট্টালিকা।

কিছুটা সময় অবশ্য স্নেহাংশু কাটাল নদীর ধারে। কিন্তু দিন থাকতে-থাকতে সে ফিরে আসবে বলে ঠিক করল। আবার তার দেখতে ইচ্ছে করল বাড়িটা। আবার ঐ ছবিটা দেখে নিতে ইচ্ছে হল তার।

জল আর জলের অরণ্য সে দেখবে সারাটা দিন ঘুরে-ঘুরে—তার সে ইচ্ছা পূরণ সে করতে পারল না। ফিরতি ট্রেনে সে উঠে বসল।

জায়গা-মত একটা পছন্দ-সই বেঞ্চিতে সে বসল। যথাসময় ছাড়ল ট্রেন। ট্রেন ছাড়া মাত্র স্নেহাংশুর শরীরে কেমন শিহরণ খেলে গেল। একটা সামান্য ব্যাপারকে সে এতই অসামান্য বলে ভেবে নিয়েছে যে, অল্পেই তার

মনের সব ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এবার সে দেখল কেবল ঐ বাড়িটাই। তার বেশি কিছু নয়। বাড়িটার কোনো বাসিন্দাকে এবার আর সে দেখতে পেল না। জানলাটা ফাঁকা।

জানলাটা ফাঁকা বটে, কিন্তু স্নেহাংশুর মন কেমন যেন ভরে উঠেছে, একেবারে ভরাট হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগে যে জিনিস সে দেখেছে চাক্ষুষ, এখন তার কাছে সেটি স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে—সে যদি কাউকে এই গল্পটা করে তবে কেউ তা বিশ্বাস করবে না। সকলেই নিশ্চয় বলবে—বানানো। কিন্তু অন্যের কথা আলাদা, তার নিজেরই কেমন অদ্ভুত আর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে এখনই।

কিন্তু কে ঐ প্রাণীটি? অমন নিশ্চল নিশ্চুপ ও নিঃসঙ্গ? স্নেহাংশু যা দেখল তাই সে ভাবছে। অথচ সত্যিই কি সে নিশ্চল নিশ্চুপ আর নিঃসঙ্গ।

পায়ের উপরে পা তুলে একটু আঁট হয়ে বসল স্নেহাংশু বিশ্বাস। না, হতে পারে না। অমন প্রাসাদপুরীতে অমন সঙ্গীহীন হয়ে থাকতে পারে না কোনো মানুষ। নিশ্চয়ই বাড়িটা, লোকে লোকারণ্য না হোক, নিশ্চয়ই বাড়িটায় লোকজন আছে অনেক। এবং—

পা দুলিয়ে-দুলিয়ে ট্রেনের তালে-তালে নিজেকে সে দোল দিতে লাগল, এবং ভাবতে লাগল—ঐ মেয়েটি ও-বাড়ির মক্ষিরাণী। লোকচক্ষুর অন্তরালে নিত্যনতুন নাটকের অভিনয় হচ্ছে ওখানে। কেউ দেখার নেই, কেউ শোনার নেই, কেউ বাধা দেবার নেই, কেউ প্রতিবাদ করার নেই। পুরাতন ঐ ভিতের আড়ালে নতুন নাটক অভিনয় করছে কারা নুনে-ধরা ইঁট আর ঘুণে-ধরা জানলা-দরজা তাদের প্রাচীন ও পঙ্গু চোখ দিয়ে প্রত্যহ দেখে চলেছে সেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি।

বেশ আনন্দ হল নাট্যকার স্নেহাংশু বিশ্বাসের। তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এত চট করে একটা নাটকের প্লট সে খাড়া করে তুলতে পারল।

কিন্তু সে পেরেছে। সে পেরে গেল। তার মনে হল, সার্থক তার এই যাত্রা। বটেই তো, কেবল ঘরের মধ্যে বসে থাকলে আর বেহালার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কি কোনো কাজ হয়? উপকরণ চাই, উপাদান চাই, তবেই আসবে উৎসাহ!

বিপুল উৎসাহ এসে গিয়েছে স্নেহাংশুর। কিন্তু, সে নিজের কাছেই শপথ করল যে, এসব কথা কারও কাছে সে ফাঁস করবে না। নিজের

মনের মধ্যে সমস্ত কিছু পুঁজি করে রাখবে; এবং ধীরে ধীরে লিখে ফেলবে এমন-একটা জিনিস, যাকে নাকি বলে পূর্ণাঙ্গ নাটক।

কয়েকদিন গত হয়েছে। স্নেহাংশু একটু যেন আলগা-আলগা থাকছে, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে তেমন যেন মিশছে না। ভাবুক লোক সে, কিসের ভাবনায় যেন বিভোর হয়েছে ও। একা-একা যা-খুশি ভাববার ভাবুক—এই রকম ভাবতে থাকে তার বন্ধুরাও। তারা থাকে নিজের-নিজের ধান্ধায়, স্নেহাংশুকেও থাকতে দিয়েছে তার নিজের মর্জি অনুসারে।

স্নেহাংশু ভাবে, যতই ভাবতে থাকে সে ততই তার কানের মধ্যে বেজে ওঠে যেন পাখোয়াজ—চাকায় এবং রেলে ঠোকাঠুকিতে বাজে যে-গান সেই-গান কেবলই শুনতে পায় স্নেহাংশু। রেলগাড়ির সেই সংগীতে স্নেহাংশু বিভোর। সেই নিঃসঙ্গ ও নীরব মেয়েটি বিপুলভাবে আকর্ষণ করছে স্নেহাংশুকে। মনে-মনে নিত্যই রেল-ভ্রমণ করে চলেছে স্নেহাংশু বিশ্বাস। স্টেশনগুলোর নাম পর্যন্ত তার মুখস্থ, ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি স্টেশন-গুলোর।—ধামুয়া, মগরাহাট, সংগ্রামপুর, দেউলা, নেত্রা, ঘাশুলডাঙা। কিন্তু ঐ কয়টি নামের মধ্যের একটা নাম তার মনে পড়ছে সবচেয়ে বেশি, সে নাম সংগ্রামপুর—ডায়মণ্ডহারবার থেকে মাত্র তিন-চারটি স্টেশন আগে এই জায়গাটি এবং এই সংগ্রামপুরই স্নেহাংশুর জীবনে এনেছে নতুন এই সংগ্রাম।

প্লট তার প্রায় প্রস্তুত, এবার কলম ধরলেই হয়। কিন্তু তার আগে নিজেকে আরও একটু তৈরি করে নেওয়া দরকার বলে মনে হয়েছে। এই জন্যে সে কয়েক দিন ধরে খুঁজে বেড়িয়েছে ঐ জায়গাটার ইতিহাস। কার বাড়ি ওটা হতে পারে, কোন্ আমলের বাড়ি ঐটি, নির্জন প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ গজিয়ে উঠতে পারে না অমন একটি প্রাসাদ, অবশ্যই ঐ জায়গাটা এককালে ছিল মস্ত একটি লোকালয়। চব্বিশপরগণা জেলার পুরনো দলিল ঘেঁটেছে স্নেহাংশু, ঐ জেলার ইতিহাসের পাতা উল্টে-উল্টে দেখেছে, কিন্তু হায়, স্নেহাংশু বিশ্বাস তার মনের মত কোনো রসদ খুঁজে পেল না। রসদ যখন সে পেলই না, তখন আর কথা কি—তখন তো তার কলম মুক্ত, তার কল্পনাও বাধাবন্ধহীন, তখন সে মুক্ত, তখন সে স্বাধীন। সুতরাং, আর কোনো দিকে না তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে সে বেছে নিল সংগ্রাম।

ছক কেটে নিল স্নেহাংশু তার নাটকের। পাঁচটি অঙ্কে সে ভাগ করল এই নাটক। যতই প্ল্যান করে সে, ততই তার শরীর যেন শিউরে উঠতে থাকে। তার কেবলই মনে হয় অদ্ভুত হবে, অপূর্ব হবে তার নাটক। তার

চোখে স্বপ্ন হয়ে যা লেগে আছে, তাকেই সে রূপ দেবে বাস্তবিক চেহারায়।

সংগ্রামপুর জায়গাটার নাম তার নাটকে হল বিক্রমপুর। এই বিক্রমপুরের একটা বিরাট ইতিহাস বানিয়ে নিল সে। এমন নিখুঁতভাবে সে তা বানাল যে, সত্যিই তা ইতিহাসের মতই তার নিজেরই মনে হল। সুতরাং তার এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না যে, এই ঘটনাকে সকলেই ইতিহাস বলেই মানবে। সে বেছে নিল সম্রাট সাজাহানকে; এঁকে বেছে নেবার কারণ হল এই যে, ইনি একটু প্রেমিক বলে খ্যাত আছেন এবং এঁর নামের সঙ্গে মমতাজমহলের নাম যুক্ত আছে। এই সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে পূর্বভারতের সমুদ্র-কিনারের একজন সামান্য ব্যক্তি তার অদ্ভুত নৌবিদ্যার জন্যে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেই কৌশলী নাবিকের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ই। সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে কৃষ্ণপ্রসাদ ভারতের নৌ-বাহিনীর নৌ-অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হয়। এবং সেইসময়ে একবার পারস্য দেশে সে যায় এবং সেই দেশের অপূর্ব রূপবতী এক নারীকে পত্নীরূপে বরণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এই সংবাদ শুনে সম্রাট সাজাহান কৃষ্ণপ্রসাদের প্রতি আরও প্রসন্ন হয়ে ওঠেন, প্রসন্ন হবার কারণ এই যে, সম্রাট যাঁকে কেবলমাত্র নাবিক বলে মনে করেছিলেন, সে যে শুধুই নাবিক নয়, সে যে প্রেমিকও—তার প্রমাণ তিনি পেয়ে গেলেন। প্রেমিক সম্রাট তাঁর প্রসন্নতার নিদর্শনস্বরূপ সমস্ত চব্বিশপরগনা জিলাটাই তাকে উপঢৌকন দিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তখন সমুদ্রের অনতিদূরে তাঁর আদিনিবাসের কাছাকাছি একটি অপ্রশস্ত শাখা-নদীর বাঁকের মুখে নির্মাণ করে তুললেন একটি প্রাসাদ। সে-কালের লোকের চোখে বিস্ময় সঞ্চার করে আকাশকে আড়াল করে দাঁড়াল এই প্রাসাদচূড়া। কিন্তু মানুষ যা চায়. মানুষ তা পায় না। একটি কন্যা ও একটি পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদকে দান করে অকালে পরলোকগমন করলেন সেই পারস্যললনা। মাতার রূপলাবণ্যের অধিকারী এই পুত্র ও কন্যা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। কিছুকাল পরে লোকান্তরিত হলেন কৃষ্ণপ্রসাদ। এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সেই কন্যার কাহিনী জানার কথা নয়, কেন না, সে বিবাহ করে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু পুত্রটি হল ঐ প্রাসাদের অধিকারী এবং বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক। বিনা-ক্লেশে অর্জিত ধনৈশ্বর্যের অধিকার পেয়ে সে হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল, নানারূপ উপসর্গ এসে উপস্থিত হল। প্রাসাদের প্রাচীরে-প্রাচীরে বেজে উঠতে লাগল আর্তনাদ।

প্রাসাদের আর্তনাদ সংক্রান্ত সংলাপ যখন পরিবেশন করতে আরম্ভ করল স্নেহাংশু, তখন তার নিশ্চয় খেয়াল হল না যে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত

পাষাণ গল্পটির প্রতিধ্বনি এসব সংলাপে শোনা যাচ্ছে। যাই হোক, এই পর্যন্ত লিখে সে শেষ করল প্রথম অঙ্ক, এই অঙ্কে দৃশ্যের সংখ্যা দাঁড়াল তিন। প্রথম অঙ্কের এই তিনটি দৃশ্যে সে নাটকের ভূমিকা করে নিল। অন্যভাবে বলা চলে যে, সে ভিত্তি স্থাপন করল তার নাটকের।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই সে চলে এল একেবারে বর্তমান কালে। যে অট্টালিকায় বিলাসের বিপুল সমারোহ চলেছে প্রথম আমল থেকে—তার চার-দেয়ালের মধ্য থেকে নির্বাসিত হতে পারে না সেই বিলাস। বংশপরম্পরা চলে আসছে সেই স্রোত। এককালে এই প্রাসাদে চলেছিল ঐশ্বর্যের বিতরণ, এখন ঐশ্বর্য নেই, তার পরিবর্তে আছে অভাব ও অনটন। কিন্তু অভাব ও অনটন আছে বলেই বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থাকবে না কেন। এককালে এক পারস্য-ললনা এই বঙ্গদেশে সৌন্দর্যের ও সুষমার যে বীজ উপ্ত করে গিয়েছেন, তার থেকে যুগে-যুগে বিভিন্ন প্রফুল্ল ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে আসছে।. বর্তমানে এক আশ্চর্য ফুল সেই আদি সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বিক্রমপুরের এই ভগ্ন প্রাসাদে।

সেই ফুলটির নাম ফুল্লরা।

এইখানেই নায়িকার প্রথম নাটকে প্রবেশ ও মঞ্চে আবির্ভাব। এবং এইখানেই দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোড়ইয়ের নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম হওয়া উচিত ছিল কৃষ্ণপুর বা প্রসাদপুর; কিন্তু তাঁর নাম অনুসারে নয়, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে জায়গাটির নাম হয়েছে বিক্রমপুর। গ্রামের লোক কৃষ্ণপ্রসাদকে ভুলে গেলেও তার বিক্রমকে ভোলে নি। এই প্রাসাদের সংলগ্ন ঐ ছোট শাখানদীতে ছোট-ছোট যে ঢেউ ওঠে এবং সেই ঢেউয়ে হাওয়া লেগে যে জলতরঙ্গ বাজে, তা বুঝি কৃষ্ণপ্রসাদের বিক্রমের কথা স্মরণ করেই। দুঃসাহসিক নাবিক ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ, বড়-বড় নৌবহর নিয়ে তিনি বড়-বড় সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, সেই বড়-বড় কীর্তির কথা ছোট গলায় ছোট ছোট শব্দে গেয়ে চলেছে এই ছোট শাখানদীটি।

মাঝেমাঝেই পাত্র-পাত্রীর মুখে এইরকম সংলাপ দিয়ে নাটকটিকে জমাট করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে স্নেহাংশু। এবং, আমরা অকপটেই স্বীকার করব যে, স্নেহাংশুর সে চেষ্টা মাঠে-মারা যায় নি। নাটকটা বেশ নাটকীয়ই হয়ে উঠেছে। এমন কি, তৃতীয় অঙ্কের গোড়ার দিকে নায়িকা ফুল্লরা যখন প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তার জীবনের কথা ভাবছে এবং জীবনকে এক-একবার ভীষণ ঘৃণিত মনে হওয়ায় নাসিকা কুঞ্চন করছে তখন তার মুখেও স্বগত সংলাপ দেওয়া হয়েছে; সেই সংলাপে সে মন্থন

করছে তার অতীত, বলছে, কোন ঘরের কন্যা সে, কোন মহামহিমান্বিত পুরুষটি হচ্ছে তার পূর্বপুরুষ, আর আজ?—আজ সে নিত্য-নতুন পুরুষ নিয়ে—

ছি ছি ছি! ফুল্লরা নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে. এমন সময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল এক সুদর্শন পুরুষ, বলিষ্ঠ চেহারা তার, চোখে প্রখর দৃষ্টি, ঠোঁটে মৃদু হাসি, বলল, 'কার কথা ভাবা হচ্ছে? কার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে?'

এই সুদর্শন পুরুষটি হচ্ছে নাটকটির নায়ক। এর নাম মধুসূদন।

ব্যাপারটা হয়েছে এই যে, নায়ক মধুসূদন এ গৃহে এর আগেও এসেছে তার বন্ধুদের সঙ্গে নেহাতই খেলার ছলে এবং হয়তো-বা একটু ফুর্তির আকর্ষণে। শহর থেকে দূরে এই জায়গাটি। এখানে এসে মনের ইচ্ছায় সময় কাটালে কারও কিছু জানবারও সুযোগ নেই, কারও কিছু বুঝবারও উপায় নেই। একটা রাত্রি মনের আনন্দে কাটিয়ে উধাও হয়ে চলে যাও, সমস্ত ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে আবার নিজের মত ভেসে বেড়াও শহরের জনস্রোতে। এমনি হাল্কা মন নিয়েই এসেছিল সে। কিন্তু ফুল্লরার কাছে এক রাত্রির নায়ক হবার ইচ্ছায় সে এসেছিল, সেই মধুসূদন নিজের অজানিতেই ফুল্লরার জীবনের অধিনায়ক হয়ে উঠল এবং ফুল্লরাকে করে নিল তার অধিনায়িকা। এবং স্নেহাংশুর নাটকের তারাই হয়ে উঠল নায়ক-নায়িকা।

অবস্থাটা এতে একটু জটিল হয়ে উঠল। যারা নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিত্যনিয়ত এই নিভৃত নিকেতনে গোপন অভিসারে আসে, তাদের অনেকের মনেই জেগে উঠতে লাগল অভিমান। হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি মনের নানাবিধ বিকারে বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল সকলের মন। কিন্তু ফুল্লরা অটলা। এক নাবিক-বংশের তনয়া সে, সে জানে ঝড় জল তুফান ভেদ করে চললে একসময়ে কূল পায় জাহাজ, ভরাডুবির হাত থেকে সে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে আনতে পারে তবেই তার বাহাদুরি, তবেই সে জাহাজ সার্থক। কিনারে এসে তখন সে চায় নোঙর ফেলতে। তটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে সে চায় নিরাপদ হতে।

কোনো দিকে কোনো কিনারা না দেখে ফুল্লরা ভেবেছিল তার জীবন এখন ভেসে চলেছে বটে যৌবন-জলতরঙ্গে, কিন্তু কত দিন আর চলতে পারে একটা জীবন এমন যৌবন-সমারোহ নিয়ে। প্রত্যহের নানারূপ অনুকূল বাতাসের সঙ্গে অনেক ঝড় জল তুফানও আসছে নিয়মিত। সে জানত তার জীবনের কোনো কিনার নেই। অপার-অকূল সমুদ্রের মধ্যে

এই-যে তার ভেসে বেড়ানো, এর পরিণাম কি সে তা জানত। এই প্রাসাদ-পুরীর অধিকারিণী সে। কিন্তু প্রাসাদের নুনে-ধরা ইঁটের স্তূপ ও দেয়ালের এই বেড়া তাকে বেষ্টন করে ধরে আছে বটে, কিন্তু তাকে প্রতিপালন করার শক্তি নেই এই প্রাসাদের। কৃষ্ণপ্রসাদের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, থাকার মধ্যে আছে কেবলমাত্র এই একটি আশ্রয়। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ তা চিন্তা করে দেখে নি ফুল্লরা, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল বাসনা তার মনের মধ্যে। বাঁচার সেই প্রেরণায় সে নিজেকে সহসা উৎসর্গ করেছিল একবার, সেই উৎসর্গটিই উপসর্গ হয়ে দেখা দিল পরে এবং তারই পরিণামে এখন সে এখানে এই অকূল সমুদ্রের মাঝখানে। এখান থেকে কূল দেখা যায় না, কিনারা দেখা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ তার জীবনে এসে গেল একটি তট, একটি তটের সংকেত। এসে গেল তার জীবনে মধুসূদন।

স্নেহাংশুর নাটকের চতুর্থ অঙ্ক এইখানে শেষ।

জীবনের সব গ্লানি এবং সমস্ত আবর্জনা দূর করে দিয়ে নতুন গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্যে প্রস্তুত হল নায়িকা ফুল্লরা। পূর্ববর্তী অঙ্কে যে ছিল রঙ্গিনীরূপে, এই পঞ্চম অঙ্কের আরম্ভ থেকেই তার রূপ গেল বদলে। সে দেখা দিল এক মহীয়সী রমণী রূপে। অচিনপুরীকে আর যেন চেনা যায় না, তারও রূপের বদল হয়ে গেল। ফুল্লরা আর মধুসূদন যাপন করতে আরম্ভ করল নতুন জীবন।

ফুল্লরার দাসী ছিল দু'জন, তার মধ্যে একজনের নাম ললনা, অন্যজনের নাম মাধুরী। মাধুরীর চেয়ে ললনার চেহারায় মাধুর্য অনেক বেশি। এখানে ফুল্লরার এই নতুন জীবনের সঙ্গে তারা দু'জনেও নিজেদের বেশ মানিয়ে নিল। কিছুকাল বেশ মধুরভাবে চলল এখানকার জীবন। কিন্তু তার পরেই একটু যেন জটিলতার সৃষ্টি হতে লাগল, একটু যেন নাটকীয় হয়ে উঠতে লাগল পরিবেশটা।

স্নেহাংশু এই জায়গায় কয়েকটা ছোট-ছোট দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এই ছোট-ছোট দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সে দেখিয়ে দিয়েছে মধুসূদনের আসল চেহারা। বেশ স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়ছে। সে দেখিয়েছে—মধুসূদনের মন-পরিবর্তনের ঘটনা। মধুসূদন নতুনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে অন্যের দ্বারা। যে তাকে আকর্ষণ করেছে সে হচ্ছে ললনা। অদ্ভুত কৌশলে স্নেহাংশু এইভাবে নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং দেখিয়েছে ফুল্লরার নতুন অবস্থা। মধুসূদনের সঙ্গে তার একটু বচসা হল কিন্তু মধুসূদন অটল। মধুসূদন ফুল্লরাকে জানিয়ে দিল যে, মধুসূদন যদি একজন অবিশ্বাসী,

ফুল্লরাই বা কি? ফুল্লরাও তো একজন ইয়ে—

মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে করল ফুল্লরা। এ জীবন রেখে লাভ নেই। সে নীরব হয়ে গিয়েছে, সে নির্বাক হয়ে গিয়েছে। কি করবে সে ভেবে পায় না। অচিনপুরীর জানালায় দাঁড়িয়ে সে বহু দূরের দিগন্তে চোখ রেখে একা-একা ভাবে তার জীবনের কথা।

বলা বাহুল্য, এইরকম এক সময়েই স্নেহাংশু ট্রেন থেকে তাকে দেখেছে।

নাটকেও স্নেহাংশু এই দৃশ্যটাকে দিল। ফুল্লরা দূরে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সে যোগ করে দিল একটা নেপথ্য কণ্ঠস্বর —ললনা ও মধুসূদন খলখল করে হাসছে।

এর পরেই যবনিকাপতন।

॥ তিন ॥

মোমিনপুরের বাড়িতে মহা সমারোহে চলেছে মহড়া। কিন্তু নায়িকা সাজছেন যিনি তাঁর আজও দেখা নেই। এ'তে নাটকটা জমতে জমতেও ঠিক যেন জমাট হয়ে উঠছে না কিছুতে। প্রথম দু'টি অঙ্ক নায়িকা-বিবর্জিত, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দিকে অবশ্য তাঁর সামান্য-একটু আবির্ভাব আছে, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই না; আসলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব তৃতীয় অঙ্কে। সুতরাং তিনি বায়না ধরেছেন যে, এরা সকলে প্রথম অঙ্ক দু'টি পাকাপোক্তরূপে তৈরি করে নিক, তারপর তিনি আসছেন। কিন্তু এদের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও সব কেমন যেন বিস্বাদ ঠেকছে, আলুনি বলে মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই। ব্যঞ্জনে নুন না হলে কি স্বাদ হয়?

হরেশ যেহেতু মিন্টের কর্মী, সুতরাং সবসময়ই সে একটু ঝুন দিয়ে সবকিছু বুঝে নেবার চেষ্টা করে। নায়িকার অভাবে সকলের মনেই একটা বিষাদ আছে, কিন্তু কেউই তা স্পষ্ট করে প্রকাশ ক'রে ধরা দিতে চাচ্ছে না। সকলেই তাদের বুকের বেদনাটা চাপা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু রেবতীর বা মনোজের বা বিকাশের কথা আলাদা, তাদের কাছে নায়িকাটি অপরিচিতা নয়, সুতরাং কৌতূহল বা রোমাঞ্চ তাদের তেমন তীব্র না হতে পারে। কিন্তু অন্যান্যরা? হরেশ, দীপক, নীহার, বীরেন? এবং তার চেয়েও বেশি যিনি, যিনি নাট্যকার—সেই স্নেহাংশু বিশ্বাস?

সুতরাং হরেশ একটু ঝুন দিল, একটা হাই তুলল, বলল, 'ভাল লাগে না এই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষারও একটা শেষ থাকবে, এইটেই ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি এর শেষ বুঝি নেই।'

সকলেই বুঝি একটু চমকাল, অমিয় আড়চোখে হরেশের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল, বলল, 'হচ্ছে কি, হরেশ?'

আক্ষেপের সুরে হরেশ বলল, 'কি আর হবে? কিছুই হচ্ছে না—সেই কথাই তো বলছি। এতদিন কেটে গেল, কিছুই এগলো না।'

রেবতী একটু শক্ত হয়ে বসে কড়া দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের এখানে আমরা মেয়ে-অভিনেতা আনছি এই প্রথম, সে মেয়ের ইজ্জৎ রেখে যেন চলতে পারি আমরা, সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই বেশ হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

হরেশ তর্ক করতে চায় না; তবু তাকে কথা বলতে হল, সে বলল,

'হুঁশিয়ার তো আছিই ভাই। কিন্তু সবসময় হুঁশ রাখা যায় না। কিছু এগলো না বলাতেই সব ইজ্জৎ চলে গেল? কিসের এগনোর কথা বলেছি বলো তো? আমি বলছি নাটকের কথা, তুমি বুঝলে নায়িকার কথা। তার মানেই হচ্ছে—নায়িকার জন্যে ছটফটানি কারও মধ্যেই কম নয়। বলো, বলো তোমরা সকলে—'

সকলে বলে উঠল, 'ইয়েস।'

বলে সকলেই হেসে উঠল।

অধ্যাপক-সুলভ গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে বীরেন বলল, 'আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি। কেষ্ট পেতে হলে কষ্ট পেতে হয় জানি, কিন্তু রাধা পেতে হলেও যে এত বাধা, কে জানত বলো!'

'নিশ্চয়।' নীহার তার কথার মধ্যে একটু ফায়ার দিয়ে বলল, 'অত ডাঁট কিসের? নাচতে নেমে ঘোমটা টেনে লাভ কি? এসে যাও আমাদের সকলের মধ্যে, মিশে যাও আমাদের মধ্যে এক হয়ে। অনেক জ্বালা আছে আমাদের জীবনে, নতুন জ্বালায় আর জ্বালিয়ো না, প্রিয়সখি!'

অভিনয় করার ঢঙে বেশ দরদ দিয়ে কথাগুলো বলল নীহার। কেউ আর তাকে ঘাঁটাতে চাইল না, প্রত্যেকেই বুঝি ভয় পেল—আরও কত কি কথা বলে বসতে পারে নীহার!

'কিন্তু ওসব থাক্।' অমিয় বলে উঠল, 'বিনা নায়িকায় অভিনয় করার অভ্যাস আমাদের আছে, সুতরাং উঠে দাঁড়াও কৃষ্ণপ্রসাদ, আনন্দে রিহার্সেল সুরু হোক।'

রিহার্সেল সুরু হয়ে গেল। হরেশকে এই ভূমিকাটা দেওয়া হয়েছে, সে সাজবে কৃষ্ণপ্রসাদ—অচিনপুরীর আদিপুরুষ সে, সুতরাং একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। এখন না হয় ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে সে দাঁড়াল, কিন্তু স্টেজে যখন সে দাঁড়াবে তখন তার সাজ হবে আলাদা রকমের। একজন ঝানু নাবিকের বেশে দেখা দেবে সে। কিন্তু তার আক্ষেপ এই যে, যে পারস্য-ললনাকে সে সাদ্ধি করে নিয়ে এসেছিল ব'লে নাট্যকার বলেছেন, তাকে একবারও নাটকের মধ্যে আনা হয় নি। আনা হলে একটু মজা করে অভিনয় করা যেত, এমন কি অভিনয় নিয়ে একটু মজে যাওয়াও যেত। যাই হোক, তা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। কৃষ্ণপ্রসাদের ভূমিকাটি সে প্রাণময় করে তোলার জন্যে বেশ চেষ্টাই করতে লাগল। অভিনয়ে তারা খাটো, এ অপবাদ তাদের আছে। এবার যদি সে পারে তবে দূর করে দেবে সেই অপবাদ।

কেবল প্রথম অঙ্ক দুটিই নয়, অন্যান্য তিনটি অঙ্কের যে কয়টি দৃশ্যে নায়িকা নেই, সেই দৃশ্যগুলিও তারা এগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অনেক

রাত্রি পর্যন্ত চলেছে তাদের মহড়া। বেশ সমারোহের সঙ্গেই চলেছে কাজ।

হরেশদের উৎসাহ এখন একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। যদিও তারা কেউই নায়ক নয়, কিন্তু পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে তারা যা পার্ট পেয়েছে, তা বেশ লম্বা। অনেকক্ষণ স্টেজে থাকার সুযোগ পেয়ে তাদের উৎসাহের মাত্রাও একটু বেশি দেখা যাচ্ছে ইদানীং।

তার উপর, নাটকের কাহিনীও তাদের বেশ মনের মত হয়েছে। তারা তাই মনে মনে তারিফ করছে স্নেহাংশুকে। লোকটা অমন চুপচাপ-গোছের, কিন্তু গল্পটা ফাঁদতে পেরেছে বেশ ভালো এবং প্রাণে যে রস আছে তার প্রমাণও দিয়েছে বেশ। এর আগে ওর মুখে কাহিনীর কাঠামোটা শুনে তেমন বুঝতে পারে নি তারা; এবার নাটকটার ভিতরে ঢুকে তারা দেখছে স্নেহাংশুটা সত্যিই একটা জিনিয়স, সত্যিই একজন নাট্যকার।

সেদিন ওরা আগে থেকেই এসে বসে আছে মোমিনপুরের রিহার্সেল-বাড়িতে। নাট্যকার আসে নি, অমিয় আসে নি, বিকাশ মনোজ রেবতীও আসে নি। হরেশ দীপক নীহার আর বীরেন বসে-বসে আলোচনা করছে, আর মনে-মনে উচ্চারণ করে যাচাই করে দেখছে তাদের পার্ট ঠিক-মত মুখস্থ হয়েছে কি না।

ক্রমে-ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। মোমিনপুরের এই বাড়িটার কার্নিশে বসে কয়েকটা কাক কোয়া-কোয়া শব্দ করে যেন জানিয়ে দিতে চাইল যে; বেলা আর নেই। ঘরের ঘুলঘুলি থেকে মুখ বার করে কিচমিচ করে উঠল কয়েকটা চড়ুই।

বারান্দায় বসে বিড়ি বাঁধছিল যারা, তারা এখনকার-মত কাজ সাঙ্গ করে উঠি-উঠি করছে। আকাশে ফুটি-ফুটি করে উঠছে কয়েকটা তারা।

ওদের সকলের আসার সময় হয়ে এল বুঝি! ওরা এলেই লেগে যাওয়া যায় রিহার্সেল নিয়ে। হরেশ উঠে গিয়ে একটা আলোর সুইচ টিপে দিল, ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল আলো। ফিরে এসে সে জোড়াসন হয়ে ঝুঁকে বসল তার ভূমিকার পাণ্ডুলিপির উপর। বেশ মনোযোগ দিয়ে ওরা চারজন ঝুঁকে বসেছে। ওরা বুঝি মশগুল হয়ে গিয়েছে নাটকের মধ্যে।

এমন সময় হঠাৎ কার গলা শুনল তারা? বেশ মিহি গলা, বেশ মোলায়েম গলা, বেশ নতুন গলা?

চমকেই উঠল ওরা চারজন। সোজা হয়ে বসল ওরা চারজন। দরজার দিকে তাকাল ওরা চারজন।

'রেবতীবাবু আছেন?

'নেই।'

'মনোজবাবু বা বিকাশবাবু?'

উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার প্রান্তটি পায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল হরেশ, বলল, 'ও'রা তো এখনও আসেন নি। এখনই অবশ্য এসে পড়বেন। আপনি—'

'আমি দিবা। আমার নাম দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বাকি তিনজন উঠে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠেছে নিশ্চয়।

হরেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আসুন। ভিতরে আসুন। বসুন আপনি। ওরা এসে পড়ল বলে।'

নায়িকা সম্বন্ধে যা ভেবে রেখেছিল তারা, তার সঙ্গে কিন্তু মিল নেই একেবারেই। একেবারে নায়িকার মতই নয়। বড়ই সাধারণ আর বড়ই সাদা-সিধে দেখতে।

ঘরটা বড়। একটা আলো জেবলে নিয়েছিল আগে, এবার আরও দু পাশের দুটো আলো জেবলে দিল। পুরনো আমলের ধুলোপড়া ঝাড়লণ্ঠনে সেই আলো পড়ে কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল যেন আবহাওয়াটা। এবং এই নিরিবিলি নিঃশব্দ পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকার মাঝখানে নায়িকাটির এই হঠাৎ আবির্ভাবে রহস্য বুঝি আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

হরেশ এতক্ষণ কথা খুঁজছিল। কি কথা দিয়ে কথা আরম্ভ করা যায় তাই ভাবছিল সে। আর কোনো কথা না পেয়ে সে বলল, 'কোনো অসুবিধে হয় নি?'

'কিসের অসুবিধে?' জিজ্ঞাসা করল দিবা।

'এখানে আসতে। এই জায়গাটা খুঁজে নিতে?'

'ওঃ এই কথা?' দিবা বলল, 'নতুন জায়গায় আসতে ওটুকু অসুবিধে হয়েই থাকে। দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করে নিলাম, তারা দেখিয়ে দিল। তার উপর মনোজবাবুরাও ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোথায় নেমে কিভাবে আসতে হবে। অসুবিধে তেমন কিছু হয় নি।'

বীরেন বলে উঠল হঠাৎ, 'আপনার কিন্তু ভীষণ সাহস। বড় রাস্তা থেকে আপনি ঢুকে পড়লেন অন্ধকার গলির মধ্যে ওই দোকানদারদের কথায়?'

হাসল দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়, বলল, 'ওটা সাহস নয়, ওটা অভ্যাস। এই-ই তো আমাদের কাজ। কত অচেনা জায়গায় অনবরতই যেতে হচ্ছে।'

'ও ইয়েস।' হরেশ বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় করেই দেওয়া হয় নি। ইনি হচ্ছেন বীরেন পালিত অধ্যাপক; উনি দীপক মিত্র—পোর্টট্রাস্টের কর্মী, সব ব্যাপারেই ওঁকে ট্রাস্ট করা যায়।' বলেই হেসে উঠল হরেশ, ওরাও সে

হাসিতে যোগ দিল। তারপর হরেশ বলল, 'আর উনি নীহার বসু—ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী, আমরা ওর ডাকনাম দিয়েছি ফায়ার।'

সকলে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করল। এবং সেই সুযোগে ওরা দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তাকে ভালো করে দেখে নেবার চেষ্টা করল।

তিনটি আলো জ্বলছে ঘরে, ঐ আলো তিনটির জন্যেই ঘরটি এমন আলোকিত হয়ে উঠেছে, কিংবা অন্য কোনো কারণে? এবার ঐ আলোতে নায়িকাটিকে যেন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, প্রথম-দর্শনে এমন মনোরম তো লাগে নি। বেশ ফ্রী, বেশ স্মার্ট, বেশ নীট, বেশ ক্লীন, বেশ ছিমছাম, বেশ সুশ্রী, বেশ সাদাসিধে।

হরেশ বলল, 'ওদের পরিচয় তো জানলেন। এবার আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, আমার নাম—'

বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসঙ্গে বেজে উঠল। এসে গেছে ওরা।

খুব আনন্দের দিন আজ, খুবই তৃপ্তির দিন। এবং অন্তত স্নেহাংশুর কাছে খুবই উৎসাহের দিন। তার রচিত নাটকে অভিনয় করার জন্যে অবশেষে এসে গিয়েছে সেই বহুপ্রতীক্ষিতা নায়িকা। স্নেহাংশু নায়িকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। সে তার স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে নাটক, তার ইচ্ছা দিয়ে নির্মাণ করেছে নায়িকা। তার সেই স্বপ্নের এবং সেই ইচ্ছার সঙ্গে এই মেয়েটির মিল সে হয়তো খুঁজতে লাগল। মিল খুঁজে পেল কি না, সে কথা সে প্রকাশ করল না, কিন্তু তার মন বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। নাট্যকারের পক্ষে যতটা স্থির ও গম্ভীর হয়ে থাকার কথা, তার চেষ্টার ফলে তার মাত্রা বুঝি একটু বেশিই হয়ে গেল। স্নেহাংশুকে বড় কঠোর-কঠিন ও অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল।

মনোজ বিকাশ আর রেবতীর কাছে এ মেয়ে নতুন না। এদের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার তাই কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

মনোজরা সকলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। বসেই মনোজ বলল, 'এরা কিন্তু সকলে অধীর হয়ে উঠেছিল। আর সহ্য করতে পারছিল না এরা।'

দিবা দেবী এ কথার মানেটা বুঝবার বা এ কথার উত্তর দেবার আগেই হরেশ বলে উঠল, 'অসহ্য। অসহ্য এই হ্যাংলামো। ওসব কোনো কাজের কথা নয় দিবা দেবী, আমরা কেউই অধীর হই নি, বরঞ্চ মনোজই অস্থির হয়ে উঠেছিল, মনোজ হচ্ছে নায়ক আর আপনি নায়িকা, সুতরাং আমাদের কারো অধীর হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওসব কথা থাক। এখন কাজের কথায়

আসুন। ওঁরা দুজন কবে আসবেন?'

'কারা? কাদের কথা বলছেন?' দিবা জিজ্ঞাসা করল।

'ললনা আর মাধুরী?'

দিবা বুঝতে পারল না কিছু, সকলের দিকেই' একবার তাকাবার চেষ্টা করে অবশেষে হরেশের দিকে তাকাল।

হরেশ বলল, 'তাও তো বটে। আপনার জানবার কথা নয়। আপনি জানবেন কি করে। নাটকটা তো আপনি সব পড়েন নি। ওদের নাম না জানবারই কথা। বলছিলাম, আরও দুটি মেয়ে আপনি নাকি আনবেন শুনেছি?'

দিবার উত্তর দেওয়ার দরকার হল না। উত্তর দিল রেবতী, সে বলল, 'তাদের আনলেই হবে পরে। ওসব এখন থাক। এবার রিহার্সেল আরম্ভ হোক।'

সকলে একমত হল এ বিষয়ে।

মনোজ উঠে এসে দিবার পাশে বসল। তারপর পরিচয় করে দিল স্নেহাংশুর সঙ্গে ও অমিয়র সঙ্গে। বলল, 'ইনি নাট্যকার, আর উনি কর্ণধার। এঁর লেখা নাটক না হলে আমাদের চলে না, আর ওঁর তদারক-তত্ত্বাবধান ছাড়া আমরা অচল। আর ওঁরা হচ্ছেন—'

মাঝখান থেকে হরেশ বলল, 'বাদ গেল মাত্র একটি বেচারী। আর সবার সঙ্গে পরিচয় উনি সেরে নিয়েছেন।'

'কে বাদ গেল?' জিজ্ঞাসা করল মনোজ।

উত্তর দিল দিবা, বলল, 'বাদ গেছেন উনি। নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছিলেন, এমন সময় আপনারা এসে পড়ায় বাধা পড়ে গেছে।'

হরেশ হেসে বলল, 'আমি কেহ নহি, আমি শুধু দীনকর্মী—কাজ করি টাঁকশালে। অজস্র অর্থের মধ্যে আমার কর্মজীবন কাটে।'

মনোজ বলল, 'এটা তোমার গর্ব হওয়াই উচিত। তবু তুমি টাকার মুখ দেখতে পাও, টাকার ঝুন শুনতে পাও। আর, আমরা? আমরা আমাদের দীনকর্মী বলে ঘোষণা করতে ভরসা পাই নে, তবেই বুঝছ আমরা সত্যিই কত দীন।'

'থাক হয়েছে।' বাধা দিল অমিয়, বলল, 'ঠিক আছে। নিজেদের দৈন্য নিয়ে বড়াই করার দরকার আর নেই। দৈন্যটা অত অহংকারের জিনিস নয়।'

দিবা এদের সকলের দিকে তাকাচ্ছে, বোধ হয় ভাবছে এ কিসের মধ্যে এসে পড়ল সে। একপাল পুরুষের মধ্যে একা নারী সে। তার কোনো দৈন্য আছে কি না সে কথা এখন ওঠে না। কিন্তু এ কথা ঠিক, দৈন্য নিয়ে দাপট করার কোনো অর্থই হয় না। সে শুনেছে, যে নাটকে অভিনয় করতে সে

এসেছে, সে নাটকের নায়িকা সত্যিই দীনহীন এবং সেই দীনতা ও হীনতা দূর করার জন্যে সেই নায়িকাটি নাকি অজস্র বিলাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে তার সেই ভগ্ন প্রাসাদের নেপথ্যে। এখানে দিবা এসে উপস্থিত হয়েছে যে প্রাসাদে —তাও তো নেহাতই ভগ্ন, এখানেও কোনো বিলাসের কোনো প্রস্তাব এদের মনে-মনে আছে নাকি?

কিন্তু এভাবে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। দিবা তার হাত-ঘড়ির দিকে একটু চুরি করেই বুঝি তাকাল।

'অল রাইট, অল রাইট, অল রাইট!' উঠে দাঁড়াল মনোজ, বলল, 'কে প্রমট্ করবে? স্নেহাংশু, তুমিই করো। তোমার নাটক, তুমিই পারবে মেজাজ দিয়ে প্রমট্ করতে। উঠে আসুন দিবা দেবী।'

কিন্তু স্নেহাংশু রাজী না। তার বানানো কথাগুলো তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলে তেমন-যেন মানান-সই হবে না, সুতরাং হরেশের দিকে এগিয়ে দিল সে পাণ্ডুলিপি।

হরেশের কোনো আপত্তি তো নেই-ই, বরঞ্চ এতেই যেন তার উৎসাহ। সাগ্রহে সে পাণ্ডুলিপিটি মেলে ধরে বলতে লাগল—বলো মনোজ, বলো মধুসূদন—

মধুসূদন॥ তোমার জীবনে হঠাৎ আমার পদার্পণে এই প্রাসাদের প্রাচীরে-প্রাচীরে কেমন শিহরণ জেগে উঠেছে, চেয়ে দেখ ফুল্লরা। তুমি যে এত ফুল্ল, এত প্রফুল্ল, এত উৎফুল্ল—এ কথা আমাকে আগে কেন বলো নি তুমি। আমি ত্রিভুবন দেখি নি, কিন্তু এটা জানি যে, ত্রিভুবনে তোমার মত সুন্দরী নেই।

ফুল্লরা॥ একটু ভেবে কথা বোলো। উচ্ছ্বাস দিয়ে কথা বললে মনের সব ভাষা চাপা পড়ে যায়।

মধুসূদন॥ (স্বগত) চাপা পড়ে যায়? কি বলে এই কুমারীকন্যাটি? নিজেকে নিশ্চয় ও দেখে নি। জলের প্রতিবিম্বেও দেখে নি বুঝি নিজেকে? ও যদি দেখতো! (একটু থেমে, প্রকাশ্যে) তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা ফুল্লরা। আমি দেখেছি অনেক চোখ, কিন্তু তোমার চোখের মত চোখ দুটি দেখি নি! এই দেখ, কি বলতে কি বলে বসেছি। তোমার চোখের মত চোখ দুটি দেখব না কেন? দুটি দেখেছি, আর দেখিছি কেবল দুটিই, তার বেশি নয়। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করো?

ফুল্লরা॥ বিশ্বাস না করার কী আছে? বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হওয়া ভালো, কিন্তু বিশ্বাস না করে নিজেকে বঞ্চনা করা ঠিক না।

মধুসূদন॥ সুন্দর সুন্দর সুন্দর। এত সুন্দর কথা তোমাকে কে

শেখালে ফুল্লরা। তোমার কথা যেন তোমার চেয়েও সুন্দর। তোমার কথা যেন তোমার ওই দুইটি চোখের চেয়েও মনোরম।

ফুল্লরা॥ (দীর্ঘনিশ্বাস) শিখতে হয়। না শিখে উপায় কি।

মধুসূদন॥ উপায় নেই বুঝি? শিখতে বুঝি হবেই? কেন, কেন শিখতে হবে অত অজস্র কথা? আকাশের তারা তো কথা বলে না, গাছের ফুলেরা তো কথা বলে না। তাদের যদি চলে কথা না বলে তবে তোমার চলবে না কেন? তুমি তারার চেয়েও উজ্জ্বল, তুমি ফুলের চেয়েও ফুল্ল। তুমি ফুল্লরা—এই তোমার একমাত্র পরিচয়।

ফুল্লরা॥ শুনে আনন্দ পেলাম। বুঝলাম, পুরুষরা অতি বিষমবস্তু। পুরুষের কাছে নারী মাত্রই পরম-লোভনীয়।

মধুসূদন॥ কঠিন আঘাত করেছ তুমি আমাকে। কিন্তু যে পুরুষেরা বিষমবস্তু, আমি সে পুরুষ নই। যে পুরুষের কাছে নারী মাত্রই পরম-লোভনীয় সে পুরুষও নই আমি ফুল্লরা। আমি তোমার হৃদয় হরণ করতে আসি নি, আমি এসেছি আমার হৃদয়টি তোমাকে উপঢৌকন হিসাবে উপহার দিতে। আমার এই দীন উপহারটি তুমি গ্রহণ করো, এই আমার নিবেদন।

ফুল্লরা॥ এই জীর্ণ অট্টালিকার আমি একমাত্র অধিবাসিনী। আমার আপনার বলতে কেউ নেই। জানি, আমি এক উচ্চবংশের কন্যা, জানি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিল আমার পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাতে আমার লাভ? আমার কে আছে? আমি একা, আমি অসহায়, আমি নিরুপায়, তাই এই নিভৃত নির্জনে তোমাদের মত পুরুষেরা নিত্য আমাকে প্রলোভন দেখাও।

মধুসূদন॥ প্রলোভন? (অট্টহাস্য)। প্রলোভন দেখাব কেন? যা সত্য বলে মানি অকপটে তাই স্বীকার করে চলি। আর কোন্ কোন্ পুরুষ তোমাকে কি বলেছে জানি নে। হয়তো তাদের বিদায় দিতে পেরেছ তুমি। কিন্তু আমি সে পুরুষ নই, আমি বিদায় নিতে আসি নি, আমি এসেছি তোমাকে গ্রহণ করতে। এসো (হস্তধারণ)।

ফুল্লরা॥ (মৃদুহাস্য)

(পট পরিবর্তন)

হরেশ পড়ে গেল একটানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনোজ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল তার ডায়লগ। দিবা দেবী বসে-বসে শুনতে লাগল তার সংলাপ। মনোজ ইশারা করে দিবাকে উঠে আসতে বলল। দিবা কেন-যেন একটু দ্বিধা করছিল।

হরেশ আবার তাকে বলল, 'এবার আরম্ভ করা যাক।'

স্নেহাংশু বসে আছে অভিভূত হয়ে। অন্যের মুখে নিজের লেখা ভাষা শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হল। কি রকম নাটকীয় করে তুলতে পেরেছে পরিবেশটা তা ভেবেই সে মোহিত হয়ে যাচ্ছে।

দিবা উঠি-উঠি করতে-করতে বলল, 'নায়িকার চরিত্রটা কিন্তু একটু কেমন হয়ে গিয়েছে। নায়িকার উপর যেন একটু অবিচার করেছেন নাট্যকার।'

'কি রকম?' স্নেহাংশুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে উঠল হরেশ। বলেই সে বলল, 'তা হবে। কাব্যেরও তো উপেক্ষিতা থাকে, স্বয়ং বাল্মীকিই নাকি উপেক্ষা করছেন ঊর্মিলাকে—পড়েন নি রবীন্দ্রনাথ? আমাদের কবি স্নেহাংশু বিশ্বাসও না হয় একটু অবিচার করেছেন তাঁর নায়িকা ফুল্লরাকে। ওতে কিছু হয় না। এটা গৌরবেরই কথা।'

অগত্যা উঠে দাঁড়াল দিবা। হরেশ প্রম্‌ট্‌ করে চলল, মধুসূদন ও ফুল্লরা বলে যেতে লাগল তাদের ডায়ালগ।

রিহার্সেল চলতে লাগল। এদিকে দীপক নীহার আর বীরেন আলোচনা করতে লাগল তাদের নায়িকাটিকে নিয়ে। মেয়েটার ঔদ্ধত্যে তারা একটু যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে। নাট্যকারের সামনে তার সৃষ্ট চরিত্র নিয়ে এমন সমালোচনার মানে হয় না। দুনিয়ার নারী মাত্রেই যেন সতী। দুনিয়ার কোনো নারী ব্যাভিচার যেন করে না! একটা বিরাট প্রাসাদের মধ্যে একা-একা থাকতে পারে যে মেয়ে, সে মেয়ের জীবনে কি কি ঘটতে পারে তা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু একটা নাটকের মধ্যে সব ব্যাপার তো খোলাখুলি বলা চলে না! খুব সংযমই দেখিয়েছে স্নেহাংশু। স্নেহাংশু না হয়ে অন্য কেউ হলে আরও কয়েকটা দৃশ্য জুড়ে দিয়ে একেবারে বেআব্রু করে দিত নায়িকাটিকে।

খুবই বুঝি বিরক্ত হয়েছে ওরা। যে মেয়ে একা-একা হাজার জায়গায় গিয়ে হাজার-হাজার পুরুষের হাত ধরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছে, সে আবার বলে অবিচার। ওটা ন্যাকামো ছাড়া কিছু না। ওটা নিজের দর বাড়ানো ছাড়া কিচ্ছু না। স্নেহাংশু নিরীহ মানুষ, তাই কিছু বলল না সে। পড়ত যদি ওদের পাল্লায় তবে ওরা দেখিয়ে দিত। অভিনয় করবি, পয়সা নিবি। সাফ কথা। এর মধ্যে অত মন্তব্যের কি দরকার?

হঠাৎ যেন চমকে গেল ওরা। ওই দিকে ওরা তাকাল। বা, বেশ সুন্দর-ভাবে তো কথা বলছে। হরেশের প্রম্‌টিং ধরে ধরে তো দিব্যি বলে চলেছে ডায়লগ—

আমি চাই নে সমাজ, চাই নে সংসার। চাই নে মান, চাই নে সম্ভ্রম। আমি চাই বাঁচতে। এই নিঃসঙ্গ প্রাসাদপুরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চাই

আমি। আমার সহায় হও তুমি, সঙ্গী হও তুমি, মধুসূদন।

ওদের মন হঠাৎ ভিজে গেল। ওরা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল দিবার মুখের দিকে। যে মেয়ে এতক্ষণ বসে ছিল এমন নির্বাক হয়ে, এমন ক্লান্ত হয়ে, এমন বিষণ্ণ হয়ে, সেই মেয়ে তার সমস্ত রূপের বদল করে দিয়ে হঠাৎ নতুন মূর্তি নিয়ে দেখা দিল।

না, জানে মেয়েটা অভিনয় করতে। মনোজদের পছন্দ আছে। ভুল করে নি মনোজরা। আসি আসি করে এতদিন না এসে মেয়েটা যে তাদের এমন উৎকণ্ঠায় রেখেছিল, সার্থক সেই উৎকণ্ঠা, সার্থক তাদের অপেক্ষা করে থাকা।

চকিতের মধ্যে দিবা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের কাছে যেন বন্দনীয়া হয়ে উঠল। যারা এতক্ষণ তার সমালোচনা করছিল এখন তারাই তার সম্বর্ধনার জন্যে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ঐ বেজে উঠেছে আবার দিবার গলার স্বর। মনোজের অনর্গল কথার উত্তরে দিবা বলল—

শান্ত হও। জীবন জুয়াখেলারই তুল্য, তা জানি। জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলি তাই আমরা। পাপ আর পুণ্য? ওসব কোনো কাজের কথা নয়। কে পাপী নয়, কে নয় পুণ্যবান? আমার বাঁচবার অধিকার আছে। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচব, আমি বাঁচব, আমি বাঁচব। তুমি যদি আমাকে বাঁচতে সাহায্য না করো, তাহলে যে আমাকে বাঁচতে দেবে আমি দ্বারস্থ হব তার। এতে পাপ কোথায়? কোনো পাপ নেই এতে। আমাকে পাপিষ্ঠা বোলো না তুমি। আমি যদি পাপিষ্ঠা তবে তুমি কোন্ পুণ্যবান; কেন তবে তুমি এই পাপিনীর জন্যে এত লালায়িত? যাও, তুমি যাও। আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্গল আজ উন্মুক্ত, এ হৃদয়ে আজ সবার প্রবেশ-অধিকার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পার ওকথা বলতে, নিশ্চয় বলতে পার—আমি স্বৈরিণী আমি স্বেচ্ছাচারিণী আমি ব্যাভিচারিণী। ওতে বিন্দুবিসর্গ ক্ষোভ নেই আমার। তা যদি বলো, তবে বুঝব যে, তুমি আমাকে চিনেছ, তুমি আমাকে জেনেছ। দীনদরিদ্রের বেশে দীনহীন হয়ে আমি থাকব কেন, আমার সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্য নাকি অফুরন্ত—তোমরাই বলো সে কথা, তাহলে সেই ঐশ্বর্যের বিনিময়ে আমি নতুন ঐশ্বর্য আহরণ করে হয়ে উঠতে চাই এই জীর্ণ প্রাসাদের সম্রাজ্ঞী।

বা, বা, বা। অপূর্ব অদ্ভুত। চরিত্রটাকে একেবারে ফুটিয়ে তুলেছে দিবা। ফুল্লরা আর তো পাণ্ডুলিপির পাতার মধ্যে অক্ষরে-অক্ষরে জড়িয়ে নির্বাক হয়ে পড়ে নেই। ফুল্লরা জেগে উঠেছে, ফুল্লরা জাগিয়ে দিয়েছে সকলকে।

অনেকগুলি দৃশ্য পর-পর মহড়া দিয়ে চলল দিবা। এতদিন সে যে আসে নি তাতে ক্ষতি হয় নি কিছু। একদিনেই অনেকটা এগিয়ে দিল সে। নিজের উপর এ বিশ্বাস তার আছে বলেই সে এদের এগিয়ে যেতে বলেছিল। পাকা অভিনেত্রী বললে ভুল করা হবে, দিবা একজন জন্ম-অভিনেত্রী। এটা কেবল চর্চা করেই অর্জন করা যায় না, এটা অর্জন করতে হয় প্রতিভা দিয়ে।

অনেক রাত হয়ে গেল আজ। এগারোটা বেজে গিয়েছে।

এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া হল বটে, কিন্তু বিশেষ করে স্নেহাংশুর ইচ্ছা হচ্ছিল—আরও হোক। সে যে এত চমৎকার করে লিখে ফেলেছে, এত সুন্দর লেখা লিখতে সে যে পারে—তার নিজেরই যেন সে কথা বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিন্তু আর না। ওরা সকলেই ক্লান্ত। দিবা তো ক্লান্ত নিশ্চয়ই। ভাব দিয়ে আবেগ দিয়ে অনেক ডায়লগ্ সে বলেছে, এটা যেমন-তেমন কথা না। এতে দম লাগে নেহাত কম না।

মনোজদের সঙ্গে দিবার পরিচয় আছে। তবুও মনোজের আজ কেমন যেন জড়তা ঠেকছে। ওরা দুজন এতক্ষণ এমন নিবিড়ভাবে প্রেমের কথা আর প্রণয়ের কথা বলেছে, এতেই মনোজের মধ্যে এই জড়তা এসে থাকবে।

মোমিনপুরের কুঠি থেকে তারা বেরিয়ে এল। বারান্দায় জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে অনেকগুলো বাণ্ডিল। ওসব কিছু না। ভিখারিরা রোজই এইভাবে এখানে আস্তানা নেয়। রাতের হিম সরাসরি এসে লাগে না তাদের গায়ে।

গলি-পথ পার হয়ে ওরা এসে পড়ল সদর সড়কে—ডায়মণ্ডহারবার রোডে। ওরা তো সবাই যাবে বেহালায়, একা দিবা যাবে অন্যদিকে— এস-প্লানেডের দিকে।

কিন্তু এই এত রাত্রে একজন মহিলাকে এভাবে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে চলে যাওয়া সংগত কি না, এ কথা ওরা সকলেই ভাবছে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলার ভরসা পাচ্ছে না। সকলের মনেই সংকোচ। যদি একে ওরা সকলেই অবজ্ঞার বা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে পারত তাহলে এমন সংকোচের কোনো প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু দিবা দেবী সকলের মনেই বেশ যেন একটু নাড়া দিয়ে দিয়েছে, সকলের মনে একটু বুঝি সাড়াই জেগেছে।

এমন কি অমিয় তরফদার, সেও যেন একটু কাবু হয়েছে। নাট্যকারের কথা তো আলাদা—তার কাবু হওয়াই স্বাভাবিক।

মাঝখান থেকে মনোজ বলল, 'চলুন; আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। একা-একা এই রাত্রে যাওয়া ঠিক না।'

কিন্তু দিবা যেন তাতে গা করল না, বলল, 'দরকার হবে না কিন্তু। এ

আর এমন কী রাত। এর চেয়ে বেশি রাত্রেও অনেক সময় ফিরতে হয় আমাদের। কখনো রাত একটা-দুটোর সময়ও তো অভিনয় ভাঙে।'

মনোজ মরিয়া সাহসে বলল, 'তবু, আমাদের দিক থেকে এটুকু ভদ্রতা করা তো উচিত।'

মরিয়া সাহস এইজন্যে যে, সে একবারও তার বন্ধুদের কথা ভাবল না, তার এতটা গরজ দেখে তারা তাকে কি বলবে, সে বিষয়ে সে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করতে পারল না।

'তবে আসুন কিছুটা।' দিবা সামান্য একটু হেসে বলল।

অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিল হরেশ, এবার সে এগিয়ে এল, বলল, 'চলো ভাই মনোজ, আমিও সঙ্গ দিচ্ছি। তুমি আবার একা ফিরবে। ওঁকে এগিয়ে দিয়ে দু-জন গল্প করতে-করতে চলে আসতে পারব। কিন্তু ফেরার সময় বাস্ পাব তো?'

একটু বিরক্ত হয়ে থাকবে মনোজ, বলল, 'কি জানি। বাস্ পাব কি না কে জানে! ট্রামও নিশ্চয় পাব না।'

দিবা হয়তো একটু হাসল, কোনো কথা বলল না। কিন্তু তার মনে-মনে ইচ্ছা যে, তার সঙ্গে কেউ না যাক।

এমন অদ্ভুত ইচ্ছাই বা তার কেন, সে প্রশ্ন আমরা তাকে করতে চাই নে, এ প্রশ্ন আমাদেরও যেন কেউ না করে। সকলের সব ইচ্ছে তোমার-আমার ইচ্ছের অনুরূপ হবে—এমন আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক না। কিন্তু দিবার ইচ্ছেটা সাচ্চা—সে চায় না কেউ তার সঙ্গে যাক। তবু, অগত্যা তাকে রাজী হতে হয়েছে। দু-জন সঙ্গী নিয়ে ঐ চলেছে দিবা বন্দ্যোপাধ্যায় কুয়াসাচ্ছন্ন ঘোলাটে আলোর আবরণে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে। ঐ চলেছে তারা তিনটি নিঃসঙ্গ ছায়ার মত একবালপুরের দিকে ফুটপাথের উপর দিয়ে। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তারা; ঝাপসা হতে হতে একেবারে ফিকে হয়ে গেল, তারপর উহ্য।

যাক্, বেহালার পথে পা বাড়াল এবার ওরা দল বেঁধে।

ওদের কারও মুখেই কোনো কথা নেই। ওদের সব কথা হরণ করে নিয়ে বুঝি চলে গেছে ওই নায়িকা, ওই নায়ক, আর ওই প্রম্টার।

মাঝেরহাট ব্রিজ পর্যন্ত ওরা চলে এল কেউ কোনো কথা না বলে। ওরা সকলেই যেন বেশ চিন্তিত, সকলেই বেশ ভাবিত।

ব্রিজে ওঠামাত্র চারদিকের হিম হাওয়া দ্বিগুণ প্রতাপে এসে ওদের জাপটে ধরল।

এই হাওয়াকে অছিলা পেয়ে অমিয় বলল, 'কড়া শীত।'

'হুঁ'। শব্দ করল নীহার বসু, বলল, 'বেশ কড়া শীত। ওরাও বেশ

কড়া পাল্লায় পড়ে গেল। রাত্রে ফিরতে পারলে হয়।'

বিকাশ আর রেবতী দু-জন দু-জনের মুখের দিকে তাকাল। তারা চেনে ওই মেয়েকে; চেনে বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে অবশ্য চেনে না। কয়েকবার একসঙ্গে অভিনয় করেছে—এই মাত্র মনোজের আজ হঠাৎ এতটা গরজ দেখে ওরাও আশ্চর্য হয়েছে, ও মেয়েকে মনোজ কি দেখে নি আগে? হঠাৎ আজ তার এতটা বিগলিত হয়ে পড়ার মানে কি?

'গড নোজ।'

বীরেন আপত্তি করল নীহারের ওই মন্তব্যে, বলল, 'না হে। গড বেচারাও জানে না, দেবা ন জানন্তি। আমরা তো সামান্য মনুষ্য। ডুবল, দু-জনে এক নৌকোয় পা দিয়ে দুজনেই ডুবে মরল। নাটক তো গেলই, নায়কও গেল, প্রম্‌টারও গেল।'

স্নেহাংশুর দরদ আছে তার নাটকের উপর, আজ সেই দরদ দ্বিগুণ করে দিয়েছে ওই অভিনেত্রীটি তার অভিনয়ের কৌশল দেখিয়ে। বীরেনের কথা মানতে সে রাজী না। না, না, যাবে না তার নাটক। তার নাটক প্রাণ পেয়ে গিয়েছে আজ। তার নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে আজ যে মেয়েটি, সে মেয়েকে ভুল ভাবতে পারছে না কিছুতে স্নেহাংশু বিশ্বাস।

স্নেহাংশু বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না। সব ঠিক আছে।'

ঢালু পথে ব্রিজ থেকে নামতে-নামতে নীহার বলল, 'বেশ। ভাবতে যখন বারণ করছ তখন না হয় না ভাবলাম। কিন্তু মেয়েটা যে সামান্য না এটা স্বীকার করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার অবশ্যই করব। ও হচ্ছে অসামান্য মেয়ে।'

'হয়েছে।' নীহার বলল, 'তুমিও ভিকটিম হয়েছ ওর।'

তর্‌তর্ করে কয়েক পা দ্রুত এগিয়ে স্নেহাংশুর গায়ের কাছে এসে সে বলল, 'ভাবতে চাই নে, তবু ভাবতে হচ্ছে—রাত বারোটায় একটা মেয়ে একা যেতে ভয় পায় না, আবার দু-জন সঙ্গী নিতেও ভয় পায় না। সে মেয়ে সম্বন্ধে আমার যা ভাববার আমি তো ভেবে ফেলেছি। ও একটা ইয়ে, যাক গে কথাটা ঘোষণা করে না-ই বললাম। কিন্তু জানো নাকি হে রেবতী, জানো নাকি বিকাশ—ও থাকে কোথায়?'

প্রথমে ওরা উত্তর দিল না, কিন্তু নীহার বার বার জিজ্ঞাসা করায় জানাল যে তারা জানে না। জানার ইচ্ছেও তাদের কোনোদিন হয় নি, জানার দরকারও হয় নি, জানার আগ্রহও হয় নি। কিন্তু আজ তাদেরও বুঝি মনে হচ্ছে—খবরটা জেনে রাখলেই হত।

রাস্তায় লোকজন নেই, রাস্তায় ট্রাম নেই, বাস্ নেই। শহরের এই

অঞ্চলটা অন্ধকারের কম্বল মুড়ি দিয়ে একেবারে নিদ্রামগ্ন।

নিদ্রিত নগরীর রাস্তা দিয়ে জাগ্রত প্রহরীর মত হেঁটে চলেছে ওরা। হাঁটতে কোনো অসুবিধে তাদের হচ্ছে না। এ-পথটুকু দল বেঁধে তারা না হয় হেঁটেই পাড়ি দেবে, কিন্তু ওই দু বেচারা যদি ফিরতেও চায় ভবে ফিরবে কেমন করে? ট্যাক্সি? হাসিই পায় ওদের। তেমন রেস্ত নিয়ে তারা সংসারেও যেমন নামে নি, অভিনয়েও না। তাদের সম্বল হচ্ছে তাদের উৎসাহ।

হরেশ আর মনোজের আশা ওরা জলাঞ্জলিই দিয়ে দিল, অন্তত আজ রাত্রিটুকুর জন্যে। করুণা হয়তো হল না তাদের জন্যে, কেন না তারা বুঝতে পারছে ইতিমধ্যে তাদের জীবনে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এক রোমাঞ্চকর নাটক।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে পিছন থেকে দ্রুতগামী একটা শব্দ আসছে। হয়তো কোনো ট্রাক আসছে। ওরা রাস্তার পাশে সরে গেল। শব্দটা তাদের কাছে আসতেই দুটো সম্মিলিত গলা ডেকে উঠল তাদের নাম ধরে।

থমকে দাঁড়াল ওরা। অন্ধকার একটা বাস্ দম কমিয়ে তাদের পাশে আসতেই বাস্-এর দরজা দিয়ে গলা বার করে দাঁড়াল হরেশ আর মনোজ। ওদের ডাকল চটপট উঠে আসার জন্যে। কিছু ভাববার আগেই ওরা দল বেঁধে উঠে পড়ল বাস্‌টায়।

ভগবান যদি জুটিয়ে দেন তবে এইভাবেই দেন।

হরেশ আর মনোজ হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে এসেছে দিবাকে—খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত। আরও এগিয়ে দিতে রাজী ছিল তারা, অন্তত এসপ্লানেড পর্যন্ত, কিন্তু দিবা কিছুতেই তাদের সে প্রস্তাবে রাজী হল না। খিদিরপুর থেকে একটা ট্রাম যাচ্ছিল, সে উঠে পড়ল সেই ট্রামে। মনোজ আর হরেশ তৎক্ষণাৎ হঠাৎ একা হয়ে গেল এবং তখন তাদের ভাবনা হল তারা এখন ফিরবে কী করে। ভাবতে-ভাবতেই তারা দু-জন হাঁটা দিল বাড়ির পথে, তারপর হাওয়া-আপিসের কাছাকাছি তারা যখন এসেছে তখন দেখতে পেল এই বাস্‌টা—খালি বাস্, চলেছে গ্যারেজে। ড্রাইভারের করুণাই সম্ভবত উদ্রেক করে থাকবে তারা, দুটি অসহায় পথিককে এই শীতের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় দেখে ড্রাইভার তাদের তুলে নিল, বেহালাতেই যখন যাচ্ছে এই বাস্, বেহালার যাত্রীদের তখন তুলে নিতে ক্ষতি কি।

এইজন্যেই তাদের মনে হয়েছে যে, ভগবান যদি জুটিয়ে দেন তবে এইভাবেই দেন।

গভীর রাত্রে বন্ধুরা যে যার বাড়ি ফিরল সেদিন। সকলেই যেন ফিরল একটু আলাদা মানুষ হয়ে। সবার মনেই অল্পবিস্তর আলোড়ন জাগিয়ে

দয়ে গিয়েছে ওই মেয়েটি—ওই দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু দিবা কি মনে নতুন কোনো দাগ নিয়ে ফিরেছে? সে কথা জানা বড় কষ্ট, কেন না দিবাকে স্পষ্ট করে জানতে পারা যায় না।

এরা তো গেল দল বেঁধে এবং এরা তো গেল যে যার বাড়িতে। এরা পুরুষ, এত রাত্রে এদের ঘরে ফেরার মধ্যে নতুনত্ব হয়তো একটু আছে, কিন্তু তার জন্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এরা তো পুরুষ, এরা রাত করে ঘরে ফিরতে পারে।

কিন্তু দিবা? দিবা এত রাত্রে একা গেল কোথায়? আস্তানা তার নিশ্চয়ই একটা আছে। কিন্তু সে কোথায়?

সে কথা এখন থাক্।

॥ চার ॥

আমরা আর-একটি বৃহৎ অট্টালিকার কাহিনীতে এসে উপস্থিত হলাম। এই অট্টালিকাটিও একটি সাধারণ অট্টালিকা নয়, এর আয়তন যেমন বৃহৎ, এর অবয়বও তেমনি বিরাট। কলকাতার মানিকতলা এলাকায়, মানিকতলা বাজারের কাছেই, এই বিরাট বাড়িটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। যে পথটির উপর এই বাড়িটি, তার নাম বারিক লেন।

বারিক লেনের এ একটা ব্যারাকবাড়ি। এর খোপে-খোপে অনেক লোক আগে বাস করত, এখন বাড়িটা ফাঁকা। কেবল এর নিচতলায় রাস্তার ধারের কয়েকটা ঘরে দোকানপাট আছে, আর মোটর পার্টসের গুদাম আছে।

বাড়িটাকে জীর্ণ বলব না, বলব দগ্ধ। তিনমহলা এই বাড়িটা একটা মজবুত কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে, দরজা-জানালার দগ্ধাবশেষ দেয়ালের সঙ্গে এক হয়ে লেগে কোনো দুর্ঘটনার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। সে অনেক দিনের কথা। বাড়িটায় আগুন লেগেছিল। একটা বড়-রকমের অগ্নিকাণ্ডই সেটা। এখনও ঐ এলাকার অনেকে ঐ আগুন নিয়ে আলোচনা করে। অনেক পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়েছে সে আগুনে, অনেক পরিবারের সর্বনাশও হয়েছে।

নিচতলার ঘরগুলির বেশির ভাগেই থাকত বিভিন্ন আপিসের পিয়ন-ধরণের মানুষ, কুলী আর ঠেলাওয়ালা ইত্যাদি, দোতলা-তিনতলার ঘরে থাকত নানারকম জীবিকার মানুষ নানারকমের সমস্যা নিয়ে। রাত্রিবেলা একতলার বিরাট বাঁধানো উঠোনে বসে ঢোলক বাজিয়ে গান গাইত ঠেলা-ওয়ালারা, দোতলা-তিনতলার ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সেই গানের হল্লার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ্যাঁচামেচি করত। দিনের বেলায় বিভিন্ন ঘরের গিন্নিতে-গিন্নিতে কলের জলের বরাদ্দ নিয়ে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি হত, ছেলেতে-ছেলেতে মারামারি হত, মেয়েতে-মেয়েতে রেষারেষি চলত। ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি বাড়িটাকে যেন মাথায় করে রাখত সকলে। কলরব-কলহ আর কোলাহল —এই ছিল বাড়িটার একমাত্র জীবন।

কিন্তু আজ সে বাড়ি স্তব্ধ, আজ সে বাড়ি নির্জন আর নীরব। নিচের তলার দোকানে-দোকানে কেনা-বেচা চলে, মোটর পার্টসের দোকানে হয়তো একটু ঠুকঠাক শব্দ।

কি করে আগুন লেগেছিল বাড়িটায়, কে লাগিয়েছিল আগুন? এসব

নিয়ে অনেক রকমের কথা শোনা যায়। কিন্তু আসল কারণ ও আসল কালপ্রিট কে জানা যায় না।

সে কথা জেনেও বিশেষ লাভ নেই, সে কথা জেনেও বিশেষ উপকার নেই। ঘটনায় যা ঘটে গিয়েছে আলোচনার মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনও অনেকের ফুরিয়েছে। কিন্তু এখনও অনেকের কানে বাজে সেই ঘণ্টার ধ্বনি, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির সেই পাগলা-ঘণ্টার শব্দ।

এখন ও-ঘটনা নিয়ে আলোচনা কেউ বড়-একটা করছে না; কিন্তু দুর্ঘটনাটি ঘটার পরে অনেকদিন ধরে এ-আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল অনেকে। কেন না, এ-ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অনেকের, সর্বস্বান্ত হয়েছে আরও অনেক বেশি মানুষ। যে ছিল বাড়িটার মালিক তারও বুঝি সর্বনাশই হয়েছে; কেন না, সেই বাড়িটার গায়ে আজ অবধি আর হাত পড়ল না কারও, কেউ এসে এর সংস্কার আর করল না। দশ বছর গত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও বারিক লেনের বিরাট এই ব্যারাকবাড়িটি সর্বাঙ্গে পোড়া দাগ নিয়ে কঠিন মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এসে তার দগ্ধ গায়ে পলেস্তারা মাখাল না, কেউ এসে বদল করে দিল না দরজা-জানালা।

সংকীর্ণ বারিক লেনের এক পাশে একটা দুঃস্বপ্নের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন এই ব্যারাকবাড়ি।

কম করে একশ'জন ভাড়াটে ছিল এই বাড়িতে। এই একটি বাড়িই ছিল এই অঞ্চলের একটা পল্লী। এই বাড়ির চাল-চলন আদব-কায়দা এই অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির থেকে ছিল আলাদা রকমের। এই বাড়িটাকে কেউ পছন্দ করত না, এ অঞ্চলে বাড়িটা ছিল যেন একেবারেই এক-ঘরে। বাড়িটা ছিল যেন ছোটলোকের ডেরা।

কিন্তু সকলেই ছোটলোক ছিল না, দারিদ্র্যই অনেককে ছোট করে রেখেছিল।

রেণুকার বাবা কাজ করতেন কলেজ স্ট্রীটের কাপড়ের দোকানে। যা রোজগার করতেন তা দিয়ে তিন মেয়ে আর তিন ছেলে নিয়ে সস্ত্রীক অন্য কোথাও বাস করা অসুবিধে; কিন্তু এখানে এক ফালি একটা ছোট ঘর নিয়ে বেশ ছোট হয়েই তিনি ছিলেন। আরামে হয়তো ছিলেন না, কিন্তু বেশ ছিলেন। কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন, এতে মাঝে মাঝে উপরি-পাওনাও তাঁর ছিল। ছিট কাপড়ের ছাঁট মাঝেমাঝেই নিয়ে আসতেন। সেই সব টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে ছোট ভাইদের জন্যে জামা-পায়জামা তৈরি করে দিত রেণুকা। নিজের জন্যেও নিশ্চয় সেলাই করে নিত জামা; কিন্তু শাড়ি তৈরি করে নিতে পারত না। এর চেয়ে বড় ছাঁট কি জোগাড় করে আনতে

পারে না তার বাবা?—ইচ্ছে হত, একথা জিজ্ঞাসা করে সে তার বাবাকে। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা সে করতে পারত না। বাবার মুখটাই ছিল কেমন-যেন, কেমন-যেন অপরাধীর মত।

রেণুকাকেই তাদের সংসারের প্রায় সব কাজ করতে হত। তার মায়ের চেহারাও বড় রুগ্ন, এবং সব সময় তাঁকে দেখায় খুবই ক্লান্ত। বসা-কাজগুলো তিনি করতেন বটে, কিন্তু ছুটোছুটির কাজগুলো করা তাঁর সাধ্য ছিল না।

একতলায় উঠোনের এক কোণে একটা বড় চৌবাচ্চা এবং একটি কল। এই বিরাট বাড়িটার যাবতীয় জলের চাহিদা মিটাতে হয় ঐ কল থেকে। চৌবাচ্চার কিনারে ভিড় জমে ওঠে সূর্য ওঠার আগে থেকেই। বাড়িটার যাবতীয় ভাড়াটে স্নান করে বাসন মাজে ওখানে; ঐ কল থেকে সংগ্রহ করে আনে খাবার জল। কলটার উপর চাপ তাই খুব বেশি।

জল টানার কাজ রেণুকা একা করে না; এ কাজে তাকে সাহায্য করে তার ভাই-বোনেরাও, ছোট বালতিতে করে বারে-বারে জল বয়ে নিয়ে আসে তারা কিন্তু তাদেরই-বা বয়স কত, তারাও তো প্রায়-শিশুই। রেণুকা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, তার বয়সই তখন বারো কি তেরো।

ঐ বাড়িতে অনেক মানুষের বাস। মানুষ যখন অনেক, তখন সেখানে বিস্তর মতের মানুষ থাকাই স্বাভাবিক। ওদের মধ্যে যাদের বিষয়বুদ্ধি আছে এবং যারা অপরের বিষয়ে মতামত দিতে ভালোবাসে তারা প্রায়ই ব্যস্ত করে তুলত রেণুকার বাবাকে। বলত, 'একটু বুঝে চলুন, হৃদয়বাবু। ছয়টি ছেলেমেয়ে আপনার, দায়িত্ব বড় কম না।'

হৃদয়বাবুর মুখ আরও অপরাধীর মত হয়ে উঠত। ম্লান হেসে বলতেন, 'অবুঝের মত তো চলছি না ভাই। কিন্তু কি ভাবে চললে যে ভালো হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।'

'মেয়েটাও বড় হয়ে উঠছে। লেখাপড়াও শিখছে না-

নিরীহ হৃদয়বাবুর মেজাজও বুঝি খারাপ হয়ে যেত ঐ কথা শুনে, একটু ভেবে বলতেন, 'তেমন ভালো ইস্কুলও তো দেখছিনে কাছে-ভিতে।'

কিন্তু ভালো ইস্কুলের অভাব যে নেই এই কলকাতা শহরে, এ খবর তাঁর অজানা নয়। যারা তাঁকে পরামর্শ দেয় তাদের থেকে বুঝি একটু বেশি খবরই রাখেন হৃদয়নাথ। সদর রাস্তার উপরের একটা দোকানে কাজ করেন তিনি, সেখানে আসে নানা জাতের খরিদ্দার, সুতরাং বহু মানুষের সঙ্গে নিত্যই তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়, বিস্তর খবরও আসে তাঁর কানে। কিন্তু সে সব কথা তো বলে লাভ নেই, তাই বেকুব সেজে থাকাটাই তাঁর পক্ষে সুবিধেজনক।

জীবনসংগ্রাম বলে একটা কথার চলন আছে। ঐ কথাটার সঙ্গেও যেমন পরিচয় আছে হৃদয়নাথের, ঐ জিনিসটার সঙ্গে পরিচয়ও আছে তাঁর তেমনি। কিন্তু তিনি যে সংগ্রাম করে চলেছেন, এমন বোধ যেন তাঁর নেই। তিনি নির্লিপ্ত, তিনি নির্বিকার। সারাদিন নম্বর গুনে-গুনে কাপড় বিক্রি করেন। নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে কথা ব'লে-ব'ল এবং নানা মানুষের নানা রকমের উক্তি শুনে-শুনে হৃদয়নাথ মানুষটা যেন সহিষ্ণুতার একটা অবতার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে নিয়ে চিন্তিত, এ ব্যাপারটা তাঁর বড় বাড়াবাড়ি ঠেকে, এক-এক সময় বিরক্তিবোধও তাঁর হয়, কিন্তু মুখে কোনো কথা তাঁর নেই।

চল্লিশ বছর বয়সও হয় নি হৃদয়নাথের, কিন্তু চেহারার উপর বয়সের ছাপ পড়েছে খুবই। যত তাঁর বয়স তার চেয়েও অনেক বয়স্ক তাঁকে দেখায়। অত বেশি বয়স তাঁর দেখায় বলেই বুঝি তাঁকে উপদেশ দেয় সকলে। ছয়টি কচি-কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে এই মানুষটা বিপন্ন অবশ্যই, কিন্তু অত উপদেশ দিয়ে ও উদ্বেগ দেখিয়ে তাঁকে আরও যে বিপন্ন করে তোলা হয় এটা বুঝি বোঝে না সকলে।

রেণুকার চেয়ে বেশি-বয়সী মেয়েও আছে এই ব্যারাকবাড়িতে। আছে মায়া, আছে মালতী, আছে ভবানী। তাদেরও লেখাপড়ার কোনো ব্যবস্থা করে নি তাদের বাপ-মা। অথচ, তাদের কথা তেমন উঠছে না, কথা উঠছে কেবল রেণুকাকে নিয়েই।

মালতীর মা ঠিকে-কাজ করে কয়েক বাড়িতে, মালতীর বাবা কাজ করে কাঠের কারখানায়। মায়ার বাবা ট্রামের কণ্ডাক্টার। ভবানীর বাবা রং-মিস্ত্রি। সুতরাং এরা তেমন ভদ্রলোক নয়; ভদ্রলোক হচ্ছেন একা ঐ হৃদয়নাথ, তিনি কাজ করেন দোকানে। তিনি যখন ভদ্রলোক, সুতরাং তাঁর জন্যেই সকলে চিন্তিত। তিনি যখন ভদ্রলোক, তখন ভদ্রভাবেই তাঁকে থাকতে হয়, হাজার রকমের বিরক্তি সত্ত্বেও মুখে তাই তাঁর কোনো কথা নেই।

বারিক লেনের ব্যারাকবাড়িটিতে এই মেয়েদের নিয়ে নানা কথা ওঠে। কিন্তু সেসব অন্য কথা। ছেলেছোকরাও আছে এ বাড়িতে অনেক। সকলে থাকেও বেশ কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেঁষি। আব্রু বা আবরণের কোনো বালাইও নেই এখানে, সুতরাং ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু কথা যে উঠবেই, সেটা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি এই ধরণের একটা ঘটনা নিয়ে গুঞ্জন যেমন চলেছে, তেমনি চলেছে গুলতানি। ব্যাপারটা নাকি খুবই লজ্জার ও খুবই ঘেন্নার। মালতী মেয়েটাকে নিয়েই চলেছে কথা। মেয়েটা নাকি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

ক্রমশ। তার উপর হালে যা কাণ্ড করেছে তা নাকি বলাই যায় না। সে কথা তবে আর বলে কাজ নেই। সহজেই আমরা সব ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছি। যার মা ভোর না হতেই ঠিকে-কাজে বেরিয়ে যায়, যার বাবা সকালবেলাই চলে যায় তার কারখানায়, তারা যখন তাদের মেয়ের কথা ভাবে না, তখন মেয়ে নিজেই নিজেকে খুশিমত একটু চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অনভ্যস্ত জীবনের এই চলায় পা একটু হড়কে গেলেই পাঁচজন লোকে সেটা পদস্খলন বলে কোলাহল করে ওঠে বটে, কিন্তু মালতীদের মত মেয়েরা করে কি? তাদের জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে তারা তাদের জীবনের চারধার যেভাবে দেখে আসছে, আদবকায়দা দেখছে যেমনটি, তার বাইরের কোনো ধরণধারণ তারা পাবে কোথায়? ঐ স্রোতেই গা ভাসিয়েছে তারা। সুতরাং ওদের কোনো ত্রুটিকে বড় করে দেখতে আমরা না-ই বা গেলাম।

আজ মালতী, কাল মায়া। আজ আন্নাকালী, কাল ভদ্রার মা। আজ লবঙ্গ, কাল লবঙ্গর মাসী—একটা-না-একটা ঝামেলা লেগেই আছে এই ব্যারাক-বাড়িতে।

কখনো ওই ঝামেলা খুবই মুখরোচক হয়ে ওঠে, কখনো আবার সব কেমন তিক্ত হয়ে যায়। কিন্তু জীবন যথানিয়মে বয়ে চলেছে এই বৃহৎ অট্টালিকায়। এর ইটে-ইটে, অর্থাৎ এর পাঁজরে-পাঁজরে, কখনো বেজে ওঠে হাহাকার, কখনো আর্তনাদ, কখনো হঠাৎ-বা একদিন উল্লাস।

এই বৃহৎ বাড়িটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না এই অঞ্চলের লোক। অথচ এই বাড়িটির উপর নজর আছে সকলের সাড়ে ষোলো-আনা। নজর থাকার কারণও অবশ্যই আছে।—এখানে আছে মায়া মালতী লবঙ্গ; এখানে আছে আন্নাকালী ভদ্রা রেণুকা। এবং এ-ছাড়াও আছে আরও অনেক মেয়ে।

পাড়ার ছোকরারা দাওয়ায় বসে আড্ডা দেয়, নানা রকম আলোচনা চলে তাদের মধ্যে। সে-আলোচনার একটা অঙ্গই হচ্ছে এই বাড়িটা। ওরা বলে, 'ওটা ব্যারাকবাড়ি নয় রে, ওটা হচ্ছে জোয়ান মেয়েদের একটা ডিপো। চারধার ওর বন্ধ, ওর ভিতরে কত-কি যে ঘটছে ভাই তা জানাই গেল না আজও।'

জানা গেল না ব'লে ওরা আক্ষেপ করে এবং জানার চেষ্টাও করে সেই সঙ্গেই। এবং দুঃখও হয়তো করে কেউ-কেউ। দুঃখ করে, কেন না অনেক মেয়েকে দেখে করুণাও হয় তাদের। তারা মনে করে যে, তেমন ঘরে জন্মালে এই মেয়েরাই অন্য রকম হয়ে যেত; ওদের চেহারার যে লাবণ্য এখন ছাই-চাপা হয়ে পড়ে আছে তা ঝিলিক দিত রীতিমত।

তাদের এই দুঃখটা সত্যিকারের দুঃখ, অথবা এটা দুঃখের মুখোশপরা এক-এক টুকরো লালসা—তা বলা বড় শক্ত।

এই পরিবেশের মধ্যে বাস ক'রে হৃদয়নাথ মনে-মনে অবশ্যই হাহাকার করেন। সমাজের যে স্তরের মানুষেরা এখানে বাস করে, তিনি নিজেকে ঠিক সেই সমাজের মানুষ বলে স্বীকার কবতে পারেন না; অথচ ব্যাপারটা মেনে না নিয়েও তাঁর কোনো উপায় নেই। অভাবেই নাকি স্বভাব নষ্ট হয়। অভাব তাঁর আছে বলেই তিনি বাধ্য হয়ে সস্তার এই ডেরায় এসে বাসা বেঁধেছেন। কিন্তু স্বভাবটা এখনো বুঝি তাঁর নষ্ট হয়ে যায় নি। তাই তিনি কষ্ট পান, মনে-মনে খুবই কষ্ট পান হৃদয়নাথ। নিচের কল থেকে জল ধরে নিয়ে যখন ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে আসতে থাকে তাঁর মেয়ে, তখন তিনি আড়চোখে এক-একবার তাকান তার দিকে এবং গোপনে দীর্ঘ-নিশ্বাসও হয়তো ফেলেন। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসের বিনিময়ে কখনো অবস্থার কোনো পরিবর্তন করা গিয়েছে বলে তিনি জানেন না। তাঁরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে বলে ভরসা নেই।

তাঁর কোনো পরিবর্তন তো হবে না, কিন্তু যাদের তিনি রেখে যাবেন তাদের কোনো পরিবর্তন হোক—এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিশ্চয় আছে।

বাড়িটার হালচাল যা দেখছেন তাতে একটু আতঙ্কিত হচ্ছেন তিনি। রেণুকার বয়সী আর যে ক'টি মেয়ে আছে তাদের সম্বন্ধেও নানা রকমের কথা তাঁর কানে আসছে। হঠাৎ তাঁর নিজের মেয়ে সম্বন্ধেই তাঁর কানে কি কথা এসে পেঁছিবে, কে জানে—এইটেই তাঁর আতঙ্ক।

দুপুরবেলা দোকানে যখন খদ্দের কম থাকে, তখন তিনি রাস্তার ট্রাম-বাস চলাচল দেখেন আর বাড়ির কথা ভাবেন। তাঁর স্ত্রী সর্বদাই ক্লান্ত, শরীরও তাঁর সুস্থ না—ছেলেমেয়েরা বেড়ে চলেছে আগাছার মতই। ঐ বাড়িতে বদ ছেলের আড্ডাও খুব। সারাটা দুপুরে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়িটার দশা যে কি রকম হয়, তা ভগবানই জানেন।

অনেক ভাবছেন হৃদয়নাথ কিছুদিন থেকেই। মেয়ের জন্যে পাত্র পাওয়া তো সহজ কথা নয়, দুপুরটা তাকে অন্য কোথাও পাঠানো যায় কি না, তার খোঁজ করছেন তিনি কয়েক দিন ধরেই।

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে ছোট একটা ইস্কুল আছে। বারিক লেনের এই বাড়ি থেকে সে ইস্কুল বেশি দূর না। হৃদয়নাথ সেইখানেই তাঁর মেয়েকে ভর্তি করে দেবেন ঠিক করলেন। মাইনেও বেশি না বলেই হয়তো তাঁর এতে একটু উৎসাহ হল।

দোতলা-বাড়ির একতলায় ছেলেদের ক্লাস হয়, ওপর-তলায় ক্লাস হয় মেয়েদের। স্বল্পবিত্ত মানুষের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশুনা করে। এখানে এসে ভর্তি হল রেণুকা আর তার বোন ফুলু।

ব্যারাকবাড়িটায় যেন হাসা-হাসি পড়ে গেল। এ এক আশ্চর্য ঘটনা এ-বাড়ির জীবনে। এই বাড়ি থেকে কোনো মেয়ে এর আগে বই বুকে নিয়ে ইস্কুলে যায় নি।

পাড়ার রোয়াকে-রোয়াকে বসে থাকে যে-সব ছেলেছোকরা, তারাও সকলে অবাক হয়ে গিয়েছে। ঐ বাড়ির বাসিন্দে অবশেষে হল কি না পড়ুয়া!

কিন্তু মজা এই, রেণুকার বাবার এই উদ্যোগে একটা বাঁধই যেন ভেঙে গেল। অবজ্ঞাত ও অবহেলিত বলে যাদের ধরে রাখা গিয়েছিল, তারাও যেন উদ্যোগী হয়ে উঠল। সুকিয়া স্ট্রীটের 'শিক্ষাভারতী' ইস্কুলে যেতে আরম্ভ করল আরও অনেকে—ভদ্রা মায়া মালতী। এতে বাড়িটার হাওয়াই যেন একটু বদলে গেল।

কিন্তু লেখাপড়া করব, লেখাপড়া ক'রে বড় হব, লেখাপড়া শিখে ভদ্র হব—এমন ইচ্ছে বা এমন আগ্রহ নিয়ে নিশ্চয় তারা সকলেই বই বুকে নিয়ে 'শিক্ষাভারতী'তে যেতে আরম্ভ করল না। ওটা ওদের কাছে একটা মজা। দুপুরটা কলতলায় বসে কলহ না করে ইস্কুলের কামরায় বসে কোলাহল করা যাবে—এমনি বুঝি তাদের আশা ছিল।

অথচ কোলাহলের কোনো ব্যবস্থাই সেখানে নেই। কোলাহল করার উপায়ও বিশেষ নেই। প্রথমটা তাই তাদের এত হতাশ হতে হল। কিন্তু সব জিনিসই তো সয়ে যায়। তাদের কাছেও তাদের এই জীবনটা অভ্যস্ত হয়ে এল ধীরে-ধীরে।

ইস্কুল যিনি চালান তিনিও দরিদ্র মানুষ। দরিদ্রের ওপর তাই তাঁর হয়তো একটু দরদ আছে। তিনি সকলের দিকেই দৃষ্টি রাখছেন।

কিন্তু দৃষ্টি রাখলে কি হবে। যারা একটু সৃষ্টিছাড়া ধরণের, তাদের ওপর দৃষ্টি রাখলেও বিশেষ কাজ বুঝি হয় না। কেন না, কয়েক দিন গত হতে-না-হতেই নতুন ছাত্রী ভদ্রা একতলার একটি ধাড়ী ছাত্রের সঙ্গে কোথায় নাকি চলে গিয়েছিল। পর দিন তাদের জেরা করে জানা গেল যে, তারা দুজনে দুপুরের শো'তে চলে গিয়েছিল সিনেমায়।

ইস্কুলের মাস্টার-মশায়রা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ইস্কুলে এইভাবে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা যখন-তখন হাওয়া হয়ে যায়, তাহলে এই ইস্কুলটাই উঠে যাবে। এই জন্যে এই ঘটনাটা নিয়ে তাঁরা বেশি কথা বললেন না, বেশি আলোচনা করলেন না। কেবল আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওদের শাসিয়ে দিলেন, ভয় দেখালেন।

হেডমাস্টার বিজয়ানন্দবাবু বুঝতে পারছেন যে, যারা এখানে ছাত্রী

হয়ে বা ছাত্র হয়ে আসছে তারা কোন সমাজের ছেলেমেয়ে। জীবনে তারা লেখাপড়ার চেহারা দেখে নি। এখানে এসে এ ব্যাপারে তাদের মনও বসছে না। তাদের মন যাতে বসে তার একটা উপায় বার করতে হবে। অন্যান্য মাস্টার-মশায়দের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজয়নন্দবাবু ইস্কুলের মধ্যে নানা-রকম খেলার ব্যবস্থা করলেন। সহজে ও সস্তায় হতে পারে, এমন সব খেলার ব্যবস্থা হল। স্নেক ল্যাডার, ওয়ার্ড মেকিং, লুডো ইত্যাদি। এতে কাজ হয়তো কিছু হল। কিন্তু কাজের কাজ যেন তেমন হল না।

ছাত্রীদের দিয়ে তিনি নাচ-গানের ব্যবস্থা করলেন। ইস্কুলের মধ্যেই সপ্তাহে একদিন আধ ঘণ্টা নাচ-গান হবে—এইরকম ঠিক হল। এতে বেশ উৎসাহ দেখা গেল ছাত্রীদের। টিফিনের সময়ে, কখনো-কখনো-বা ছুটির পরে মেয়েরা তাদের দিদিমণিকে নিয়ে বসে যেত গান শিখতে।

দিদিমণি ছিলেন মাত্র একজনই, তাঁর নাম ইলা।

নাচ-গান ক্রমেই বেশ জমে উঠল। যাদের গলায় গান হতে পারে বলে কেউ কখনো ভাবে নি, তারাও বেশ সুরেলা গলায় গান করছে; যাদের পায়ে নাচের তাল কখনো ফুটবে বলে কেউ কখনো বিশ্বাস করে নি, তারাও বেশ তাল রক্ষা করে নাচতে পারছে।

ইলা সেনের আনন্দ এতে ধরে না। এ-সব ব্যাপারে ইলা সেনের সহযোগী হচ্ছেন তরুণ মাস্টার-মশাই অপরেশ বসু। অপরেশ বসুও ছাত্রীদের কৃতিত্বে বেশ খুশী।

অল্প কিছুকালের মধ্যে ইস্কুলের চেহারাই যেন অনেকটা পাল্টে গেল। ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ তো এলই, মাস্টার-মশায়রাও যেন বেশ আনন্দলাভ করতে লাগলেন।

ইলাকে ডেকে বিজয়ানন্দবাবু বললেন, 'ওদের দোষ কি দেব। দোষী আমরাই। ওরা কি চায়, আমরা তা জানার চেষ্টা করি নে। আমরা যা চাই, আমরাই তা চাপাতে চাই ওদের ওপর।'

ইলা বলল, 'ওদের বেশ উৎসাহ এসেছে। এইভাবেই লেখাপড়াতেও ক্রমে-ক্রমে মন হয়তো দেবে ওরা। প্রথম-প্রথম ওরা যেমন ছিল, এখন যেন তেমন বেয়াড়া আর নেই। তাই ভাবছি—'

ইলার মুখের দিকে চেয়ে তিনি জানতে চাইলেন ইলা কি বলতে চায়।

ইলা বলল, 'অপরেশবাবু তো সঙ্গে আছেনই, হয়তো কোনো অসুবিধে হবে না। ভাবছি—ওদের দিয়ে একটা ড্রামা অভিনয় করাব।'

'ড্রামা?' একটু যেন চমকেই উঠলেন বিজয়ানন্দ। ড্রামা মানে নাটক? ইস্কুলের মেয়েরা নাটক করবে—এ প্রস্তাবটা বিজয়ানন্দের কাছে একটু বুঝি

বাড়াবাড়ি শোনাল। তিনি কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন।

বিজয়ানন্দ একটু বৃদ্ধ মানুষ, একটু বুঝি গোঁড়া ধরণেরই মানুষ। ইলা বুঝতে পারল না, হঠাৎ এ প্রস্তাবে মত দিতে বিজয়ানন্দের দ্বিধা হচ্ছে কেন। তাই ইলা বুঝিয়ে বলল তার প্রস্তাবের কারণ ও প্রস্তাবের বিষয়। সে জানাল যে, নাটক বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু করার ইচ্ছে তাদের নয়। কোনো ভালো নাটক থেকে ভালো-ভালো দৃশ্য বেছে নিয়ে দু-একটা দৃশ্য অভিনয় করানো তাদের ইচ্ছে। এতে ফল ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। অল্প বয়সে তারা যদি ভালো-ভালো রচনা মুখস্থ করে নিতে পারে এই সুযোগে, তাহলে বড় হয়ে তারা ওর দ্বারা লাভবানই হবে। বয়স বেড়ে গেলে কোনো লেখা—তা গদ্য হোক বা পদ্যই হোক—মুখস্থ হতে চায় না। আবৃত্তি বা অভিনয় করালে—

আর বলতে হল না, বিজয়ানন্দ মাথা দোলাতে লাগলেন, যেন ইঙ্গিত করে বোঝাতে লাগলেন, যে আর বলতে হবে না, তিনি বুঝতে পেরেছেন।

বিজয়ানন্দের অনুমতি পেয়ে ইলা এবং তার সঙ্গে অপরেশ কাজ আরম্ভ করে দিল। আবৃত্তির আর অভিনয়ের অংশ তারা বেছে বার করতে আরম্ভ করল। দিন কয়েকের মধ্যে নির্বাচনের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তারা ঠিক করতে আরম্ভ করল কাকে দিয়ে কোন্ অংশ করানো হবে।

এই বাড়িটার তিন-তলায় একটা ছোট ঘর আছে। সেটা বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। সেটা চিলেকোঠা। সেইখানে আরম্ভ হল রিহার্সেল। টিফিনের সময় অথবা ছুটির পরে সেইখানে আরম্ভ হল মহড়া।

দর্শক বা শ্রোতার তেমন ব্যবস্থা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরাই দর্শক ও শ্রোতা। কিন্তু এবার এলেন অভিভাবকরাও। তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনানো হল।

এই এলাকায় 'শিক্ষাভারতী'র বিশেষ নাম ছিল না, বিশেষ পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু এইসব অনুষ্ঠান ও উৎসব 'শিক্ষাভারতী'কে এই অঞ্চলে বেশ পরিচিত করে তুলল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা জাগানো ছাড়াও আরও একটা লাভ হল এই প্রতিষ্ঠানের—এখানে অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে লাগলেন। ইস্কুলটা ক্রমেই একটু ভারী হয়ে উঠতে লাগল।

এবং আরও একটা মজার কথা এই যে, বারিক লেনের ব্যারাকবাড়ির আরও অনেক মেয়ে এসে ভর্তি হল এখানে এবং সেখানকার অনেক ছেলেকেও এখানে ভর্তি করে দিলেন তাদের বাপ-মা।

বারিক লেনের ব্যারাকবাড়ির জীবন কিন্তু চলেছে তেমনি, তেমনিই চলেছে নিয়মমত। কলঙ্কের কথা, কেলেঙ্কারির কথা এখনো চলেছে সকলের

মুখে মুখে। ঘটনায় কি ঘটছে বলা কষ্ট, কিন্তু রটনাটি আছে অব্যাহত। এই অপদার্থ একটি বাড়ির বাসিন্দেরা যে লেখাপড়ার ব্যাপার নিয়ে এতটা মেতে উঠেছে—এটাই এ তল্লাটের মুখরোচক আলোচনার একটি বিষয়। কাঠমিস্ত্রির রাজমিস্ত্রির ট্রামকণ্ডাক্টারের রংমিস্ত্রির আর ঠিকেঝিয়েদের ছেলেমেয়েরা এবার বুঝি সকলে মস্ত মস্ত স্থানীগুণীই হয়ে উঠবে। পাড়ার আর পাঁচটা ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের ভাত বুঝি মারবে তারা।

কিন্তু ভদ্রা যে আগের থেকে অনেক ভদ্র হয়েছে, মালতী যে আগের থেকে অনেক নম্র হয়েছে, মায়া যে আগের মতন অতটা বেহায়া আর নেই—এ কথা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে সকলকে মেনে নিতে হবেই। এই বাড়ি থেকে সবচেয়ে প্রথমে যারা গিয়ে যোগ দিয়েছিল ঐ ইস্কুলে, সেই রেণুকা আর ফুলুও এখন যেন বদলে গিয়েছে অনেক।

হৃদয়নাথ তাঁর মেয়েদের দিকে তাকান। কিন্তু মন্তব্য করেন না।

ব্যারাকবাড়ির অরবিন্দ ঘোষাল লোকটিকে সকলেই একটু সমীহ করে চলে। সঙ্গে সঙ্গে হয়তো একটু ভয়ও করে। ভীষণ ধরনের মানুষ তিনি নন, কিন্তু সব বিষয়েই কৌতূহল তাঁর ভয়ানক. অন্যের ব্যাপারে অজস্র উপদেশ দেওয়ার অভ্যাস তাঁর বিপুল।

ইনিই সেই ভদ্রলোক—যিনি হৃদয়নাথকে মাঝে-মাঝে উত্ত্যক্ত করে থাকেন। ক্ষীণজীবী হৃদয়নাথ ঠিক পেরে ওঠেন না অরবিন্দ ঘোষালের সঙ্গে। হৃদয়নাথের ছেলেপিলে অনেক—এইটেই বুঝি হৃদয়নাথের অপরাধ, এই জন্যেই অনবরত তাঁকে নানা উপদেশ শুনতে হয়। কিভাবে সংসার চালানো উচিত, মেয়েরা বড় হয়ে উঠলে তাদের দিকে কিভাবে নজর রাখা দরকার—এই ধরনের নানা উপদেশ।

মুখ বুজেই শোনেন হৃদয়নাথ, কিন্তু এক-এক সময় মুখ তাঁর খুলতেও ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, তাঁর যা-কিছু বলার সব কথা বলে ফেলে ব্যাপারটা একদিন চুকিযে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

সেদিন দোকানের কাজ সেরে ক্লান্ত হয়ে হৃদয়নাথ ঘরে ফিরছেন। নিচের উঠোনটা পার হয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ির কাছে পেঁছেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে দেখলেন অরবিন্দ ঘোষাল একা-একা দাঁড়িয়ে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছেন।

একটু কেশে অরবিন্দ বললেন, 'ফিরলে ভায়া? দিন-গত পাপক্ষয় হল তাহলে আজকের মত?'

হৃদয়নাথ একবার মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'যা বলেছেন। আজকের মত হল।'

'ছেলেমেয়েদের তো খুব লেখাপড়ায় লাগিয়ে দিলে,' অরবিন্দ বললেন, 'প্রত্যেককেই বুঝি লাট-বেলাট করে তুলতে চাও? এত মাইনে গুণছ কি করে? উপরি কিছু হচ্ছে নাকি ভায়া?'

খুবই বিরক্ত হলেন হৃদয়নাথ, বললেন, 'আপনার খবর কি বলুন? একেবারে একা মানুষ আপনি। আপনার কথা ভেবে মায়া হয়। দিনগুলো কিভাবে আপনার কাটে, ভাবতেই পারি নে।'

'ভেবে লাভ নেই। অন্যের কথা ভেবে লাভ নেই হে, হৃদয়নাথ। নিজের কথা একটু ভাবো।'

'এই কথাই ঠিক বলেছেন।' বলেই হৃদয়নাথ সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলেন উপরে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাড়িটার ঘরে-ঘরে জ্বলে উঠেছে ডিবে আর হারিকেন। সেই আলো আর সেই ধোঁয়া একাকার হয়ে বাড়িটার চেহারা হয়ে উঠেছে রহস্যময়।

হৃদয়নাথ ধীরে ধীরে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন। হারিকেনটা ঘিরে গোল হয়ে বসে গিয়েছে তাঁর ছেলেমেয়েরা। অদূরে উনুনের পাশে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী, উনুনের আলোয় তাঁর স্ত্রীর মুখটাও একটু অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে।

বাবার পায়ের শব্দ পেয়ে ছেলেমেয়েরা নড়ে-চড়ে বসল। তারা সরে বসায় হারিকেনের আলো একটু ছড়িয়ে পড়ল ঘরের দেয়ালে ও মেজেতে।

ছেলেমেয়েরা বই খুলে বসেছিল। রেণুকা সেলাই করছিল ভাই-বোনেদের জন্যে জামা। তার বাবা ছাঁট-কাপড় নিয়ে এসেছেন কিছুদিন হল, অনেকদিন সেলাইয়ে হাত দেওয়া হয় নি, আজ কাপড়গুলো ছড়িয়ে নিয়ে সে মাপ ঠিক করছিল।

উনুনে টগবগ করে ভাত ফুটছে। তার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন হৃদয়নাথের স্ত্রী।

রেণুকা উঠে তার বাবার হাত থেকে থলেটা নিয়ে ঘরের এককোণে রেখে দিল। বাবার জামা খোলা হলে তাঁর হাত থেকে সেটা নিল।

হৃদয়নাথ মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর শরীর খারাপ নাকি? অত মন-মরা দেখছি যে!'

'না বাবা, শরীর তো ভালো আছে।'

'ইস্কুল হচ্ছে তো? পড়াশুনা চলছে তো?—বেশ, তাহলেই হল।'

হৃদয়নাথ বসতে যাচ্ছেন, রেণুকা মাদুরটা পেতে দিল, তার কোণে হৃদয়নাথ বসতে যাবেন এমন সময়ে দরজার ওপাশ থেকে কাশির শব্দ ও বিড়ির গন্ধ এল।

অরবিন্দ ঘোষাল এসেছেন। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি, সব লেখাপড়া হচ্ছে বুঝি? বেশ, বেশ।'

ঘরের ভেতরে এসে তিনি মাদুরের কিনারে বসলেন। এই বৃদ্ধ মানুষটির এখানে সর্বত্রই অবারিত-দ্বার, তাই তাঁর এরকম আগমনে কেউ কিছু মনে করল না।

অরবিন্দ ঘোষাল অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি একা মানুষ। একা থাকার সুবিধে কি, অসুবিধে কি—তাও বললেন। আরও বললেন, একা হয়ে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। বলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি।

ছাঁট-কাপড়গুলোর দিকে তাঁর চোখ পড়ে গিয়েছে। এটা লক্ষ্য করে হৃদয়নাথ একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। এবার এই ব্যাপারটা নিয়ে অরবিন্দ ঘোষালের কাছ থেকে নিশ্চয় কিছু উপদেশ শুনতে হবে।

ঠিক তাই। অরবিন্দ ঘোষাল বিড়ির টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'ও কাপড় নিশ্চয় কিনে আনতে হয় না? অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বোলো—কিনতে হয়।'

চুপ করে গেলেন হৃদয়নাথ, ভীত হয়ে উঠলেন হৃদয়নাথের স্ত্রী, লজ্জা বোধ করতে লাগল রেণুকা।

অরবিন্দ বললেন, 'কিন্তু আমি জানি কিভাবে এনেছ ভায়া। এ ছাড়া উপায় কি? মানুষকে বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে মানুষ হাবুডুবু খায়, কিন্তু বাঁচার জন্যে একটু যদি ঘুষ খায়—অমনি আমরা খাপ্পা হয়ে উঠি। কি আর রোজগার করো, এতগুলো পোষ্য তোমার। চুরি তো তুমি করো নি, তুমি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছ। মগজ দিয়ে বিচার করলে বলব—তুমি অসাধু; কিন্তু হৃদয় দিয়ে বিচার করলে বলব—সাধু সাধু!'

বলেই অরবিন্দ ঘোষাল প্রাণখুলে সশব্দে হেসে উঠলেন।

তারপর বললেন, 'তুমি হয়তো আমার ওপর রাগ কর, কিন্তু তোমার জন্যে আমার মায়া হয় হৃদয়নাথ।'

এই মানুষটি অনেকদিন ধরে লেগে আছেন হৃদয়নাথের পেছনে। এই-ভাবে লেগে থাকার জন্যে হৃদয়নাথ যে বিরক্ত হন, তাও জানা আছে ঐ মানুষটির। তবু তিনি নিত্যই নানা কথা বলে চলেছেন। এসব কথা বলাতেই যেন তাঁর আনন্দ।

অরবিন্দ ঘোষালের সেদিনের অট্টহাসির কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে হৃদয়-নাথের। হাতে-হাতে চোর ধরে ফেলে চোরকে তিনি তিরস্কার না করে যেন তাকে পুরস্কারই দিয়ে গেলেন সেদিন। কথাটা প্রায়ই মনে পড়ে হৃদয়নাথের।

অরবিন্দ ঘোষালও প্রায়ই আসেন। তিনি যে সকলের সব খবর রাখেন, তাও জানা যায় তাঁর কথায়। কিন্তু তাঁর কথা কেউ কিছু জানেও না, জানতে চায়ও না। নিচতলার একটি ঘর নিয়ে একা থাকেন তিনি, একাই রাঁধেন, একাই খান। কেবলমাত্র এইটুকু খবর তাঁর সম্বন্ধে জানা।

রেণুকার মন কিছুদিন থেকেই ভারি-ভারি। এর কারণ কি, কেউই তা জানে না। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষাল মানুষটা বড় অদ্ভুত, রেণুকা নিচের কল থেকে জল ধরে নিয়ে ওপরে যাচ্ছিল, বৃদ্ধ লোকটি পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেবল তোর বালতিতেই না, তোর চোখেও কেন জল রে?'

চমকে উঠল রেণুকা, বলল, 'না তো।'

অরবিন্দ ঘোষাল হাসলেন, বললেন, 'ইস্কুলটা তোদের ভালো। মাস্টার-মশায়রাও ভালো। এখন, ছাত্রীরাও ভালো হলেই সোনায়-সোহাগা হয়। ভালো ছাত্রী হ, তোর বাবা খুশি হবে। তুই নাকি দিব্যি অভিনয়ও করতে পারিস রে, রেণু!'

বালতিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়েছিল রেণুকা, সেটা তুলতে-তুলতে বলল, 'ছাই পারি। আমার থেকে ভালো করে এমন অনেক আছে আমাদের ইস্কুলে।'

'তাই বুঝি? তাদের মতন অত ভালো পারছিস নে বলেই বুঝি মনটা তোর এমন গুমট হয়ে আছে? সেইজন্যেই, না অন্য কোনো কারণে রে?'

রেণুকা বলল, 'জানি নে। কিছুই জানি নে।'

ওপরে চলে গেল সে। নিচে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ ঘোষাল একটা বিড়ি ধরালেন এবং মাথা নাড়তে লাগলেন একা-একাই।

বৃদ্ধটাকে বড় ভয় করে চলতে লাগল রেণুকা। কি কথা যে তিনি বলতে চান, তা ধরা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার বড় ভয় হচ্ছে।

কিন্তু ব্যাপারটা জানে এই বাড়িরই আরও কেউ-কেউ, জানে ভদ্রা, জানে মায়া। আরও কেউ জানে কি না, তা অবশ্য জানে না রেণুকা।

সেদিন রেণুকা ইস্কুল থেকে ফিরছে, তখন অরবিন্দ ঘোষাল বারিক লেনের ওপর দাঁড়িয়ে। রেণুকা কাছে আসতেই তিনি বললেন, 'তোদের ইলাদি নাকি যেমন ভালো পড়ায়, তেমনি ভালো আবৃত্তিও করে? খুব ভালো শেখায় নাকি সে?'

'হ্যাঁ। ইলাদি খুব ভালো।'

'আর ইয়ে—আর তোদের মাস্টারমশাই অপরেশ?'

রেণুকা চমকেই উঠল বুঝি। একটু থেমে বলল, 'তিনি আমাদের পড়ান না, আবৃত্তি-টাবৃত্তি শেখান।'

'বেশ।'

রেণুকা ভেতরে চলে গেল।

ঐ ব্যাপারটা নিয়েও ঘটেছে একটা মজা। অপরেশ হচ্ছে একটা চালাক-চতুর চটপটে ছেলে। ছেলেই তাকে বলা ঠিক। বয়স বেশি না, বাইশ-তেইশ হবে। বেশ আবৃত্তি করে। শিক্ষাভারতীর অভিনয়ে-আবৃত্তিতে সেই হচ্ছে ইলাদির সহকারী।

মেয়েদের মনে ছাপ সে ফেলেছে। ব্যাপারটা হয়তো গভীর বা গুরুতর তেমন-কিছু না। কিন্তু তিলকে তাল করা হয়ে গিয়েছে। এর মূলে আছে ভদ্রা। রেণুকাকে নিয়েই বেশি মেতে থাকে অপরেশ, কেন না তার মনে হয় রেণুকার মধ্যে অভিনয়ের শক্তি যেন বেশ আছে। তাকেই তাই বেশি তালিম দেয়। এজন্যে ভদ্রারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। রেণুকাকে এ নিয়ে বিস্তর আজেবাজে কথাও তারা প্রায়ই বলে।

রেণুকার মন তাই কিছুদিন থেকে ভালো না। অপরেশ সম্বন্ধে আগে সে তেমন ভাবে নি, কিন্তু ওদের কাছে তাকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা শুনতে-শুনতে রেণুকা হঠাৎ যেন একদিন আবিষ্কার করল যে. সে সত্যিই—

এ রকমের উপলব্ধি জীবনে তার এই প্রথম, এইজন্যে এর যন্ত্রণাটা তার কাছে বড়ই তীব্র বোধ হচ্ছে। কিছুদিন থেকেই চলেছে এই বোধটা। কিছুদিন থেকেই তার মনটা তাই বড় গুমট, বড় ভারি-ভারি।

তার বাবার ছাঁট-কাপড়ের ব্যাপারটা যেমন হাতে-হাতে ধরে ফেলেছিলেন ঐ বৃদ্ধটি, তার আঁতের কথাটাও তিনি তেমনি কী করে ধরে ফেললেন?

কিন্তু এ বাড়ির সমস্ত ঘরই তাঁর কাছে অবারিত-দ্বার, এ বাড়ির সকলেই তাঁকে মনের আগল খুলে দিয়ে সব কথা বলে। সুতরাং তাঁর পক্ষে ধরে ফেলাটা খুব বড় কৃতিত্বের কাজ নয়।

কিন্তু রেণুকা যা নিয়ে বিব্রত সে কথা সে মনের অর্গল খুলে কাউকে বলতে পারে না এবং আরও মজা এই—যাকে নিয়ে সে এত বিব্রত সেই মানুষটিও রেণুকার মনের এই কথাটি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

একটি বোধকে একা-একা লালন করে রেণুকা মনে-মনে যেন পুড়ে যাচ্ছে, একেবারে পুড়ে যাচ্ছে বলেই তার ধারণা।

সকলের মুখের দিকে সে তাকায় সন্ত্রস্ত হয়ে। তার কেমন-যেন মনে হয়, তার মনের এই কথাটা সবাই বুঝি জেনে ফেলেছে। তার মুখের ওপরে বুঝি ছাপ পড়ে গিয়েছে তার মনের ইচ্ছাটার।

মনের মধ্যে তার এই গভীর একটা চেতনা জেগে উঠেছে বলেই হয়তো সরস্বতী পুজো উপলক্ষে তাদের ইস্কুলে সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার অভিনয়ে

বিম্বিসারের' ভূমিকা সে অমন প্রাণ ঢেলে করতে পেরেছে।

'বিম্বিসারের ভূমিকায় সত্যিই বড় সুন্দর অভিনয় করেছে রেণুকা। মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে যখন সে বলেছিল—

দ্বাদশ বৎসর
করেছি কঠোর তপ।
যদি তাহে হয়ে থাকে
ধর্ম উপার্জন,
করি, রাজা, তোমারে অর্পণ
সুপুত্র হউক তব।

তখন শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই অভিভূত হয়ে যায়। রেণুকার গলার স্বরের ও বলার ভঙ্গির খুবই তারিফ করে সকলে।

রেণুকার তখন খুব নাম ইস্কুলে। তার পরে গরমের ছুটির আগে, ইস্কুল বন্ধ হবার দিন, একটা ছোটখাট আবৃত্তি-অনুষ্ঠানের জন্যে সকলেই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠল। ইলাদি ও অপরেশ কিছুদিন দেখল, কি অভিনয় করানো যায়। বিজয়ানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে তারা ঠিক করল, এবার হবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'। ইস্কুলের ছাত্রীর পক্ষে এটা গুরুপাক কি না, সে বিবেচনা অবশ্য তাঁরা করলেন না।

কিছুদিন পরে টিফিনের সময়ে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেণুকাকে শেখাতে লাগল অপরেশ। অপরেশ বলে যেতে লাগল খুব আবেগ দিয়ে ও খুব দরদ দিয়ে। তার গলার স্বরে বেজে উঠল যেন করুণ আবেদন, সে বলল—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

রেণুকার যেন মনে হল, ঐ কথাগুলো অপরেশ বলছে তাকে উদ্দেশ করেই। তার মন রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হয়ে উঠতে লাগল।

রেণুকা বলল, সেই গলায় গলা মিলিয়ে বলতে লাগল—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা

বার-কয়েক রেণুকা বলে গেল সমস্ত অংশটা। দু-এক জায়গায় একটু-আধটু শুধরে তাকে নিতে হল। শুধরে নিয়ে আবার সে বলতে লাগল বই দেখে দেখে।

কিন্তু বই দেখে তো বলা যাবে না বেশিদিন। কিন্তু এর মধ্যে মুখস্থ সে করে নেবে বলে জানাল ইলাদিকে।

ইলাদি বললেন, 'খুব প্রাণ দিয়ে করবে। চমৎকার হবে।'

চমৎকার হতেই হবে, রেণুকারও প্রবল ইচ্ছে তাই। সে বসে-বসে মুখস্থ করতে আরম্ভ করল দীর্ঘ কবিতাটি।

কবিতাটির পুরো মানে বোঝার সাধ্য তখনও তার হয় নি। কিন্তু আভাসে যেটুকু বুঝেছে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। পতিতা কাকে বলে তা সে জানে, তা সে জেনেছে। এই কবিতাটি হচ্ছে তেমনি একটি নারীর ক্রন্দন। এটা যদি ক্রন্দন তাহলে তার আবৃত্তির মধ্যে সেই ক্রন্দনটি ফুটিয়ে তুলতে হবে।

তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল রেণুকা। সব সময়ই সে মনে-মনে অথবা চাপা-গলায় আবৃত্তি করে ঐ কবিতা।

সুনাম লাভ করার মধ্যে ঝঞ্চাট অনেক; সুনাম হওয়ার ঝকমারিও আছে। বিম্বিসারের ভূমিকায় তার আবৃত্তিতে যথেষ্ট সুনাম হয়েছে, এখনো সকলে তার উল্লেখ করে থাকে। এইটেই যেন হয়েছে তার ল্যাঠা। নাম একবার ভালো হয়ে গেলে সে নাম রক্ষা করার দায়িত্বটা যে কত কঠিন, রেণুকা তা এখন বুঝতে পারছে মর্মে-মর্মে।

প্রায় গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে সে। একে গরমকাল, তার উপর নীচতলা থেকে টেনে-টেনে উপরে জল তোলা। এতেই সে প্রায় কাবু। তার উপর মাথায় কঠিন দায়িত্বের এই বোঝা।

আর, ভিতরে-ভিতরে আছে অন্য-একটা উত্তাপ। যতই যে মনে-মনে আবৃত্তি করে কবিতাটি, ততই যেন মনে হয় কে যেন তাকে উদ্দেশ করে বলছে—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

অপরেশের কাছে এখনো সে পাঠ নিচ্ছে। অপরেশের মতে রেণুকা তৈরি হয়ে গিয়েছে অনেকটা।

প্র্যাকটিসেই নাকি পারফেক্ট হওয়া যায়, আরও প্র্যাকটিস করলে চমৎকার হবে। ইলাদিরও তাই মত। বিজয়ানন্দবাবুও মাথা নেড়ে-নেড়ে সেইরকম অভিমতই জানান।

পতিতা নামক একশ্রেণীর যে মেয়ে আছে, তাদের উপর বড় করুণা হতে থাকে রেণুকার। বড় বেচারী বলে মনে হয় তাদের। তাদের উপর ঘৃণা হয়তো আছে অনেকেরই কিন্তু রেণুকা এদের ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে না। বড় অসহায় বলে মনে হয় তাদের, বড়ই মায়া হয় যেন তাদের উপর।

অনেকে বলছে বটে, এবং কয়েকজন মাস্টারমশায়ও সে কথায় সায় দিচ্ছেন বটে যে, এ-রকম কবিতা ছাত্রীদের দিয়ে আবৃত্তি না করানোই ভালো ছিল। কিন্তু রেণুকা কিছু বলছে না বটে, কিন্তু ওসব কথার হেতুও সে বুঝছে না। কেন, খারাপটা এমন কি হয়েছে? এতে তো ভালোই হল। এতে তারা বুঝতে পারল—পৃথিবীর এক জাতের মেয়ের জীবন এবং তাদের জীবনের গ্লানি।

অরবিন্দ ঘোষাল তো এতজন গেজেট-বিশেষ। তিনি সব জানেন। রেণুকার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসেন আর বলেন, 'কতদূর এগোলি রে? যাব, যাব। তোরা নেমন্তন্ন করিস বা না করিস, যাব তোদের ইস্কুলে, শুনব তোর ফাইনাল আবৃত্তি।'

'খবর বুঝি জানেন আপনি?' রেণুকা জিজ্ঞাসা করে।

'তা আর জানি নে?' অরবিন্দ ঘোষাল বলেন, 'সব জানি। তুই যে পতিতা সাজছিস, তা জানি রে জানি।'

'কি বললেন?'

'তুই পতিতা সাজছিস।'

সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল রেণুকার। সে তো জানত, সে করুণা করে ঐ ধরনের মেয়েদের। কিন্তু এখন তার সমস্ত শরীর যেন ভরে উঠল অন্য জিনিসে—ঘৃণায়। নিজেকেই কেমন-যেন ঘৃণ্য মনে হল তার।

রেণুকা বলল, 'ছি ছি ছি!'

অস্ফুটে সে ঐ শব্দ করল বটে, কিন্তু তার ইচ্ছে হল চিৎকার করে ওঠে। এ কি পরিচয় হল তার। লোকে তাকে বলবে কি? লোকে তাকে ভাববে কি? ঐ বুড়ো মানুষটাই যদি অমন কথা বলছে, তখন পাড়ার ছেলে-ছোকরারা কি ছেড়ে কথা বলবে? এমনিতেই তো তারা যা-খুশি তাই বলে বেড়াচ্ছে। তাদের মুখের লাগাম নেই, তার উপর এই কথার খেই তারা পেলে কি আর রক্ষে আছে তার?

অরবিন্দ ঘোষালের সময় অফুরন্ত। তিনি ঘরে-ঘরে গল্প করে বেড়াচ্ছেন। হয়তো তাঁর মতলব খারাপ না, কিন্তু কিছু ভেবে তিনি কথা না বললেও তাঁর কথায় অনেকের অনেক অস্বস্তি যে ঘটে—এ-চিন্তাই হয়তো তিনি করেন না।

রেণুকা ঘরের এক-কোণে বসে চোখ মুছছিল। দিদির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফুলু তার কাছে গিয়ে বলল, 'কি হল দিদি? কেউ বকল নাকি তোকে? বাবা কিছু বললেন নাকি রে?'

কিন্তু রেণুকা জানাল, কিছু হয় নি, বলল, 'পড়া হয় নি আজ। ইস্কুলে

যেতে ভয় করছে।'

ঐ অছিলা করে সে ইস্কুলে গেল না। তার ইচ্ছে, কোনোরকমে যদি সে পারে, তবে করবে না সে এই আবৃত্তি। সারা দুপুর বসে-বসে ভাই-বোনেদের জন্যে সে ছাঁট কাপড় জুড়ে-জুড়ে জামা সেলাই করল। চুপ-চাপ একা থাকতে-থাকতে তার মনের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা এসে ভিড় করল। মনের মধ্যে যে একটা চেতনা সে চাপা দিয়ে রেখেছে, সেই চেতনাটা যেন তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

সূঁচ-সুতো সরিয়ে রেখে কাগজ-কলমও সে নিল একবার। ইচ্ছে হল—তার মনের কথাটা সে কয়েক লাইনে লিখে জানায় অপরেশকে।

দু-চারটে কথাও সে লিখল। মনে-মনে সে বুঝি আবৃত্তি করে দেখল সেই কথাগুলো শুনতে কেমন লাগছে। পরখ করে দেখল, শুনতে লাগছে ভালোই, কিন্তু সংকোচও যে হচ্ছে তেমনি।

না না না, ওসব পারবে না রেণুকা। তার মনের কথা চাপা থাক মনের মধ্যেই। নতুন করে সে আর তৈরি করে নিতে চায় না আর একটা বিপদ, আর-একটা গ্লানি।

রেণুকা সেলাই করে চলল এক-মনে।

ব্যারাকবাড়ির জীবন বয়ে চলেছে যথানিয়মে। খুব নিরিবিলি জীবন হয়তো একে বলা যায় না, কিন্তু এ জীবন বড়ই বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু রেণুকার জীবন তার নিজের কাছেই কেমন যেন বিচিত্র হয়ে উঠছে। তার মনের মধ্যে যেমন জ্বলছে আগুনের একটা কুণ্ড, তার বাইরেও যেন তেমনি অনল। সে অতি সামান্য, সে অতি সাধারণ, দরিদ্র পিতার বস্তিবাসী কন্যা সে। এটা একটা বস্তি তো অবশ্যই। পাকাবাড়ি বলেই একে প্রাসাদ বলা যাবে না। বস্তিবাসী হয়ে তার মনে কেন জাগে অসম্ভব সব ইচ্ছা! তার মনের ইচ্ছার কথাটা যদি কেউ জানে তাহলে তারা তাকে বলবে কি! কি ভাববেন ইলাদি, কি ভাববেন হেডমাস্টারমশায়, আর আর আর, থাক, আর ভাববে না রেণুকা।

এ বাড়ির সামনে মস্ত-মস্ত গাড়ি এসে দাঁড়ায় বলেই কেউ যেন মনে না করে যে, ঐ গাড়িগুলি এ বাড়ির বাসিন্দাদের। ওখানে গাড়িগুলো আসে মেরামত হতে। রাস্তার ধারের লম্বা ঘরটার সারা গায়ে কালি-মাখা কয়েকটা লোক চলাচল করে, গাড়ি সারায়, পেট্রল ঢালে। তার পাশেই একটা রঙের দোকান। অনেক রকমের রঙ বিক্রি হয় ওখানে। বাড়িটাকে যদি রঙদার বলা যায় তাহলে কেবলমাত্র ঐ দোকানটার জন্যেই বলা যায়।

রেণুকার মনও একটু রঙদার হয়েছে। সেইজন্যেই হয়তো তার মনে পড়ে

গিয়েছে রঙের দোকানটার কথা। এবং তার আবৃত্তি করার বিষয়টা নিয়ে তার মনে একটু কালি পড়েছে বলেই সম্ভবত মোটর-মিস্ত্রীদের কালো কালো চেহারাগুলি ভেসে উঠেছে তার চোখে।

সেদিন বিকালে রাস্তায় কিসের হল্লা হল। ঐ শব্দ শোনামাত্র রেণুকার মনে হল, ওরা বুঝি আলোচনা করছে তাকে নিয়েই। অরবিন্দ ঘোষালের কথাটা তার মনে পড়ল, কানের মধ্যে শব্দ করে উঠল তাঁর সেই প্রশ্নটা—'তুই নাকি পতিতা সাজছিস?'

বড় বিশ্রীভাবে কথা বলেন ঐ মানুষটি। তার বাবাকেও বড় জ্বালাতন করেন মাঝে মাঝে। বাবার ছেলেপিলে অনেক এই নিয়ে বাবাকেও বড়ই বিব্রত করে তোলেন উনি!

রেণুকা এখন একটু বড় হয়েছে, এখন সে বুঝতে শিখেছে কিছু কিছু। তা ছাড়া, অনটনের সংসারে বাস করলে অভিজ্ঞতা একটু বাড়েই।

রাস্তায় হল্লা আগেও হয়েছে, কিন্তু তখন ও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে। কিন্তু এখন একটু আধটু চ্যাঁচামেচি হলেই সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার এ পরিবর্তন হল কি করে তা ভেবে পায় না সে। তার মনে তবে কি সত্যিই কোনো পাপ ঢুকেছে? কিন্তু কোনো পাপ তো সে করে নি, কোনো পাপের কথা কখনো ভাবেও নি সে। তবে তার এ পরিবর্তন হল কেন?

উপরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রেণুকা উঠোনে উঁকি দিল। বাইরে ঝগড়া চ্যাঁচামেচি চলেছে, কিন্তু উঠোনের একপাশে বারান্দার কোণে বসে নিরিবিলি কথা বলে চলেছেন অরবিন্দ ঘোষাল ও তার বাবা।

দু-কান গরম হয়ে উঠল রেণুকার। বাবার কাছে ঐ ভদ্রলোক কি কি কথা যে বলছেন কে জানে! দুনিয়ায় এমন খবর নেই যা জানেন না ঐ ভদ্রলোক। এমন কি, রেণুকার মনের কথাটিও উনি জেনে বসে আছেন কি না কে জানে!

কিন্তু অরবিন্দ আজ কথা বলছেন অন্য ব্যাপার নিয়ে। অন্তরঙ্গভাবে তিনি বলে চলেছেন অন্য কথা। তাঁর হাতে একটা খবরের কাগজ।

অরবিন্দ বললেন, 'আমার ছিল আটটি সন্তান। খুব গর্ব ছিল আমার। অষ্টসন্তানের পিতা আমি। আমি গর্ব বোধ করতাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে তামাসা করত আশপাশের মানুষ। আমার বিয়ের বারো বছরের মধ্যে আটটি সন্তান পাই আমি।'

হৃদয়নাথ বললেন, 'তারা সব এখন কোথায়?'

উত্তর দিলেন না অরবিন্দ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। বোঝা

গেল তাদের কাছ থেকে তিনি খুব ঘা পেয়েছেন।

ঘা অবশ্যই পেয়েছেন অরবিন্দ ঘোষাল। কিন্তু কিভাবে তিনি আঘাত পেয়েছেন সেই কথাটাই তিনি বুঝি বলার জন্যে আজ ব্যাকুল হয়েছেন। সেইজন্যেই হৃদয়নাথকে ডেকে নিয়ে নিভৃত এই কোণটিতে তাঁর বসা। আজ সকাল থেকে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করছে অজস্র হাহাকার। আজ সকালের কাগজে একটা সংবাদ পাঠ করার পর থেকেই তিনি অধীর হয়ে আছেন। কিন্তু হৃদয়নাথ সারাদিন ছিলেন না বলে বলা হয়নি। এখন হৃদয়নাথকে পেয়ে তিনি তাঁকে ছাড়েন নি।

অরবিন্দ বললেন, 'আপনার অনেক সন্তান। এ নিয়ে আমি আপনাকে অনেক কথা বলেছি। হয়তো কখনো রাগ করেছেন, হয়তো কখনো বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু ঘরপোড়া গোরু আমি, জ্বালা কাকে বলে তা আমি জানি। সেইজন্যেই হুঁশিয়ার করেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু হুঁশিয়ারীর কি কোনো মানে আছে? ওটা আমার একটা পাগলামি। নিজেকে চিনি। নিজে কি তা জানি। কিন্তু দুঃখ এই—আমাকে কেউ চিনল না। আমাকে কেউ জানল না।'

নিজেকে যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগল হৃদয়নাথের। কখনো এঁর সঙ্গে গরজ করে কথা তিনি বলেন নি, প্রায় সময়ই লোকটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা তিনি করেছেন—সেসব যেন তাঁর অপরাধ হয়ে গিয়েছে বলে আজ তাঁর মনে হচ্ছে।

অরবিন্দের সমস্ত কাহিনী শুনে হৃদয়নাথ বুঝতে পারলেন যে, অপরাধ তাঁর সত্যিই খুব হয়েছে। মানুষটাকে বুঝতেই পারেন নি তিনি আগে।

পাবনা জেলার মানুষ অরবিন্দ। সচ্ছল অবস্থারই মানুষ। অনেকটা এই রকমেরই একটা পাকাবাড়ি ছিল। জমিজমা ছিল। সেখানকার মানুষ তাঁকে বলত জমিদার। শিকার করতে খুব ভালোবাসতেন তিনি। পাখি শিকারই করতেন বেশি। বাঘ শিকার কখনো করেন নি, কিন্তু হরিণ খরগোশ মেরেছেন অনেক। সেসব কথা ভেবে আজ তাঁর দুঃখ হয়, আক্ষেপও হয়। বলা যায় না হয়তো এইসব নিরীহ প্রাণী বধ করার জন্যেই শাস্তি তিনি পেয়েছেন। শাস্তিটা বড় কড়া শাস্তি হয়ে গিয়েছে, বড় কঠিন শাস্তি।

খুব জাঁক করে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। খুব ঘটা হয়েছিল। তাঁর বৌয়ের কথা তিনি আজ আর বেশি কিছু বলবেন না, কিন্তু এইটুকুইমাত্র বললেন যে, খুব গুণবতী মেয়ে ছিল তাঁর স্ত্রী, খুব সুন্দরীও ছিল বলেই আজও তাঁর মনে হয়। কিন্তু ওসব কথা ভাবতে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে না। কিন্তু হঠাৎ আজ তাঁর নতুন করে মনে পড়ে গিয়েছে সব কথা। এই জন্যেই হৃদয়নাথকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর এত কথা বলা।

হাতের মধ্যে ধরা খবরের কাগজের দিকে একবার তাকালেন অরবিন্দ।

পর পর চারটি পুত্র, তার পরেই পর পর চারটি কন্যা এল তাঁর ঘরে। আশপাশের মানুষরা হাসাহাসি করতে লাগল। তাঁর স্ত্রীকেও নাকি অনেকে অনেক রকম কথা বলেছে। কিন্তু হাসাহাসির ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়েই দিয়েছেন তিনি। তাঁর ছেলেমেয়েরা খাবে কি—এ কথা তো আর ওঠে নি। কিন্তু গাঁয়ে নতুন বৌ এল, অথচ সেই বৌটিকে বৌরূপে কেউ যেন তেমন পেল না—ঘরে আসার পর থেকেই সে—মা হয়ে চলেছে।

কত পাখি, কত হরিণ, কত খরগোশ—প্রায়ই এসব শিকার করে ঘরে নিয়ে আসতেন অরবিন্দ ঘোষাল। কাজ তো ছিল না কিছুই, শিকারটাই ছিল নেশা। ঐ নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে ছিলেন অরবিন্দ।

'অনেক ছেলেপুলে ছিল আমার।' অরবিন্দ বললেন, 'অত ছেলেপুলে থাকার অর্থ হয় না। এইজন্যেই ঐ কথা নিয়ে আপনাকে জ্বালাই।'

নিজের কথা আরও অনেক বলে গেলেন তিনি, তারপর বললেন, 'এই বাড়িতে আমি আছি আজ বিশ বছরেরও বেশি। আপনি এসেছেন তো অনেক পরে। আপনার পুত্রকন্যারা তো এল একে একে আমারই সামনে। লক্ষ্য করে যেতাম, কিছু বলতাম না। কিন্তু একদিন আলাপ করে নিলাম আপনার সঙ্গে কেবল ঐ কথা বলার জন্যেই—আপনাকে হুঁশিয়ার করার জন্যেই। ওরা আসে, অন্য কিছুর জন্যে নয়, ওরা আসে যন্ত্রণা বাড়াবার জন্যে।'

ধীরে-ধীরে যেন সব বুঝতে পারছেন হৃদয়নাথ। তাঁরও পুত্রকন্যা আছে, তাদের কাছ থেকে কোনো-কিছুর প্রত্যাশা তিনি করেন না। তাঁর সাধ্যমত তিনি করে চলেছেন তাঁর কর্তব্য। কুড়িয়ে-কাচিয়ে নিয়ে আসছেন যতটুকু তাঁর সাধ্য। তারপর? তারপর কে যে কি করবে, ভগবান জানেন।

অরবিন্দ ঘোষাল বললেন, 'বহু পুত্রকন্যা থাকা একটা বিরাট সমস্যা। কোন্‌টি মানুষ হবে, কোন্‌টি হবে না—কে বলতে পারে বলুন। কিন্তু প্রত্যেকটিকে সমানভাবে মানুষ করার দায়িত্ব আপনার। মানুষ কি তা পারে? পারে না। অথচ তাকে সবসময় একটা চিন্তায় ও ভাবনায় থাকতেই হয়। সাধ করে কেন মানুষ নেয় এই ঝকমারি! ঐ জন্যেই আপনাকে হুঁশিয়ার করি।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উঠোনটা ভরে গেছে অন্ধকারে। ঘরে-ঘরে ডিবে জ্বলে উঠেছে, ঘরে-ঘরে লণ্ঠন। সেই অস্পষ্ট বারোয়ারি আলোয় ব্যারাক-বাড়িটার চেহারা ঝাপসা হয়ে এল। সেই আলোয় বড় রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল অরবিন্দ ঘোষালকে।

অরবিন্দ বললেন, 'ত্রিশ বছর হয়ে গেল। আমি হঠাৎ একদিন একেবারে মুক্ত একেবারে স্বাধীন হয়ে গেলাম। সমস্ত চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম আমি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আজকের কাগজ দেখেছেন নিশ্চয়? বড় মজাদার খবর বেরিয়েছে একটা।'

কাগজ তো দেখেছেন হৃদয়নাথ। দুপুরবেলা দোকানে যখন ক্রেতা কম থাকে, তখন রোজই কাগজ পড়েন। আজও পড়েছেন। দেশবিদেশের নানা-রকম খবর পড়েছেন, হৃদয়বিদারক খবরও পড়েছেন একটা, কিন্তু মজাদার কোনো খবরের কথা তো তাঁর মনে পড়ছে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অরবিন্দ বললেন, 'ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের কাছে সেই দুর্ঘটনার সংবাদটা দেখেছেন?'

চমকে ওঠার মত করে হৃদয়নাথ বললেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। সে তো হৃদয়-বিদারক খবর একটা। ওরা আপনার কেউ নাকি?'

'আমার কেউ না।' অরবিন্দ কাগজটা খুলতে-খুলতে বললেন, 'কিন্তু এতদিন বাদে, ত্রিশ বছর বাদে, আজ কেন-যেন মনে হচ্ছে ওরা আমারই—'

কাগজটা তিনি অকারণেই খুলছেন। এই অন্ধকারে তার একবর্ণ পড়া যাবে না। তবুও তিনি খুললেন। বড়-বড় হরফে সংবাদটা প্রথম পাতায়ই ছাপা আছে, তিনি মেলে ধরলেন কাগজটা নিজের চোখের সামনে।

কাগজের দিকে চেয়ে বললেন, 'নিশ্চিন্ত। একটা পরিবার হঠাৎ কিভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। চমৎকার।'

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের কাছে কাল ঘটেছে এই ঘটনা। চারটি মেয়ের সলিলসমাধি ঘটেছে। মৃত্যু তাদের টেনে এনেছিল অনেক দূর থেকে। মেদিনীপুর থেকে তারা এসেছিল ব্যারাকপুরে—বিয়েবাড়িতে। বিয়ের পর-দিন রিক্সা চেপে তারা এল গান্ধীঘাটে গঙ্গা নাইতে। আঘাটায় নেমেছিল এই চার বোন, জলে পা দিয়েই অথৈ জলে চলে যায়। স্রোতের টানে ভেসে যায় বহু দূরে, দুজনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, দুটি এখনো নিখোঁজ।

অরবিন্দ বললেন, 'যার মেয়ে ওরা সে ভদ্রলোককে নিশ্চয় এই মেয়েদের মানুষ করা নিয়ে অনেক উপদেশ শুনতে হয়েছে আত্মীয়স্বজনের কাছে, অনেক দুশ্চিন্তাও ভোগ করেছেন নিশ্চয় তিনি। কিন্তু মজাটা কেমন হল? সব সাফ, সব নিশ্চিন্ত।'

এই সংবাদে ত্রিশ বছর আগের ঘটনা নতুন করে মনে পড়ে গিয়েছে অরবিন্দ ঘোষালের। চলন-বিলের নাম শুনেছেন? নাম তার বিল বটে, কিন্তু সাগর না হলেও সেটা একটা উপসাগর-বিশেষ। বিরাট আর বিশাল তার

আকার। এ-কিনার থেকে ও-কিনার দেখা যায় না। ভরতপুরে অরবিন্দের মামার ছেলের বিয়ে। সেই বিয়েতে চলেছে অরবিন্দের স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে—আটটি ছেলেপিলের মধ্যে বড়টির বয়স এগারো, কোলের কন্যাটির বয়স ছয় মাস। মস্ত নৌকোয় মালপত্র বোঝাই ক'রে তাঁর স্ত্রী রওনা হলেন ভরতপুরে। চলন-বিল ডিঙিয়ে ওপারে গেলেই ভরতপুর। একটা দিন ও একটা রাত্রির পথ।

চৈত্রের তখন শেষ। আকাশ পরিষ্কার। সমস্তটা দিন প্রখর রৌদ্র ভেদ করে জলে ভাসতে-ভাসতে চলেছিল নৌকোটা। বিকেলের দিকে হঠাৎ ঈশান কোণ অন্ধকার করে মেঘ উঠল। সেই মেঘ ডিঙিয়ে হঠাৎ এল ঝড়। তারপর কি হল কেউ জানে না।

হৃদয়নাথ বলে উঠলেন, 'কি হল, কি হল?'

'কিচ্ছু না। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম আমি। একেবারে কি রকম যেন হয়ে গেলাম আমি। মাস-খানেক ছিলাম চুপ ক'রে। কত লোকে সান্ত্বনা দিতে আসত। অসহ্য লাগত তাদের সেসব কথা। তারপর, কি জানি কেন, সব ফেলে রেখে মুক্তপুরুষের মত বেরিয়ে পড়লাম। সে তো বহুদিন আগের কথা। আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকলে আজ তারা সবাই কত বড় হয়ে যেত। কিন্তু তারা বড় হল না। আমার চোখে আজও তারা তেমনি শিশু। কিন্তু আমি কেমন বুড়ো হয়ে গেলাম।'

একটানা এতগুলো কথা বলে অরবিন্দ ঘোষাল থামলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

আজকের এই সংবাদটা নতুন করে তাঁকে আবার পুরাতন দিনের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। এইজন্যেই তাঁর এত কথা বলা। বাড়ি-ঘর-দোর-বিষয়-সম্পত্তি সব পরিত্যাগ করে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান অরবিন্দ ঘোষাল। আট-দশ বছর তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এখানে-ওখানে, তারপর বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, অবশেষে এসে আস্তানা নেন এখানে—বারিক লেনের এই ব্যারাকবাড়িতে।

হয়তো মাঝে-মাঝে মনে পড়ে দেশের কথা ও আত্মীয়স্বজনের কথা, কিন্তু সেসব মায়া আর মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেই তিনি চলেছেন। শিকার করেছেন অনেক—পাখি খরগোশ হরিণ, সে কথা ভেবেও আক্ষেপ হয় একটু-একটু।

অরবিন্দ ঘোষালের জীবন-উপাখ্যান শোনার পর থেকে হৃদয়নাথ একটু যেন বদলে যাবার চেষ্টা করছেন। কারও উপর কোনো মায়া-মমতা রাখার ইচ্ছে যেন তাঁর হচ্ছে না।

রেণুকারা বাবার কোনো পরিবর্তন অবশ্য ধরতে পারছে না। কিন্তু কেন-যেন বাবার হাল-চাল দেখে বাবার উপর কেমন মায়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বাবাটা বড় দুঃখী। বাবার দুঃখ যদি কখনো ঘুচাতে পারে, তার জন্যে নিজেকে তৈরি করে তোলার চেষ্টা করে রেণুকা। আবৃত্তির মহড়া দিয়ে-দিয়েই নিজেকে তৈরি অবশ্য করছে না, সে মন দিয়ে পড়াশুনাও করছে।

কিন্তু মন দিয়ে পড়াশুনা করবে তার সাধ্য কি। হট্টগোল লেগেই আছে বাড়িটায়। ইদানীং গোলমালটা আরও যেন বেড়েছে। ঐ মোটর-মিস্ত্রিরা অনবরতই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। বাইরের কয়েকটা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে সেদিন তো রীতিমত মারামারিই করেছে।

রেণুকারা লণ্ঠন ঘিরে বসে পড়াশুনা করছিল, তার মা দরজার পাশে বসে কোলের বাচ্চাটিকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। হৃদয়নাথ অন্য কোণে অন্ধকারের মধ্যে বসে ছিলেন একা।

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাঁচামেচি শোনার পর তিনি নিজের মনেই বললেন, 'না। এখানে আর থাকা যাবে না। ভদ্রলোকের পক্ষে এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।'

কথাটা যেন নতুন লাগল রেণুকার। তারা যে ভদ্রলোক, একথা এতদিন একবারও তো বলেন নি তার বাবা। আজ বাবার কথাটা শুনে একটু যেন নতুন লাগল, একটু যেন ভালো লাগল তার।

তা হলে, তার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জেগে আছে, সে ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করলে অশোভন হবে না তবে? অপরেশকে তবে অপদস্থ করা হবে না? মনে যেন একটু জোরই পেল রেণুকা, মনে-মনে সে গুঞ্জন করল—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা

সত্যি, কে তার জীবনে এনে দিল এই দিবা? অন্ধকার রাত্রির অবসান ঘটিয়ে কে এখন দিল এই অভ্যুদয়? অপর্যাপ্ত আলোর আয়োজন কে করে তুলল তার জীবনে?

গরমের ছুটি হতে তাদের আর দেরি নেই। তাদের আবৃত্তির দিনও প্রায় এসে গেল। সবই ভালো লাগছে, সব ব্যাপারেই তার উৎসাহ হচ্ছে—কিন্তু অরবিন্দ ঘোষালের সেই কথা এখনো তার কানের মধ্যে মাঝে-মাঝেই শব্দ করে ওঠে—'তুই পতিতা সাজছিস?'

অমনি তার সব উৎসাহ নিবে যায়, মনে হয়, এইটেই তার পরিচয় হয়ে না যায়।

কিন্তু ওসব কথা নিয়ে সে বেশি আর ভাবতে রাজি না। যা থাকে ভাগ্যে, যে ভার সে নিয়েছে মাথা পেতে, সে ভার বয়েই বেড়াবে সে। লোকে যা

বলার তা বলুক; লোকে বললেই তো সে তেমনি হয়ে গেল না। লোকে তো কতজনকে কত কথা বলে। তাকে নিয়ে যদি কেউ আলোচনা করে তবে সেটাও তো তার ভাগ্য।

হৃদয়নাথের সঙ্গে অরবিন্দের ভাব যেন আজকাল একটু গাঢ় হয়েছে। অনেক সময়ই তাদের দেখা যাচ্ছে একসঙ্গে, তাঁরা দুজনে প্রায়ই নানারকম গল্প-গুজব করছেন।

আসলে অরবিন্দের উপরে খুবই মমতা জন্মে গিয়েছে হৃদয়নাথের। মানুষটা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা যে কত বড় ভুল—এটা বুঝতে পেরেই হৃদয়নাথ নিজের কাছে বেশ সংকোচ বোধ করেন।

হৃদয়নাথ নিজেদের ভদ্রলোক বলে ঘোষণা করতে পেরেছেন, অরবিন্দ ঘোষাল যে ভদ্রলোক—একথা জানার পরে। মনে যেন বল পেয়ে গিয়েছেন অনেক।

হৃদয়নাথ বললেন, 'এ বাড়িতে আর থাকা যায় না। ভদ্রলোকের বাসের যোগ্য যেন নয় এটা। ক্রমেই বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

অরবিন্দ তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'গরীব হওয়া কোনো অপরাধ ন। এখানে আমরা যারা আছি সবাই গরীব। কিন্তু আচরণটা ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে, তাই না?'

তাই। হৃদয়নাথও তাই বলেন। কিন্তু দিন-দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা। বললেন, 'মেয়ে বড় হয়ে উঠছে। তাই ভাবনাও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।'

চুপ করে শুনলেন অরবিন্দ, কোনো উপদেশ দিলেন না। একটু পরে বললেন, 'আমারও ইচ্ছে এখান থেকে চলে যাই। দাঁড়ান, এবার খুঁজতে বের হবো নতুন ডেরা।'

'আমার জন্যেও—'

বাধা দিয়ে অরবিন্দ বললেন, 'তা আর বলতে? আমাকে আপনি অতটাই স্বার্থপর মনে করলেন নাকি? এ জায়গাটা ক্রমেই গুন্ডার আড্ডা হয়ে উঠছে। রোজ ঝগড়া, রোজ মারামারি। কি নিয়ে যে ওদের লাগে ভগবান জানেন।'

কিন্তু অরবিন্দও কিছু জানেন। এ বাড়িতে অনেক মেয়ে আছে, রেষা-রেষি তাদের নিয়েই।

ব্যাপারটা কেবল ভগবানের ও কেবল অরবিন্দেরই জানা রইল না আর। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল প্রায় সকলেরই। এবং বিষয়টা জটিল হয়ে উঠল ক্রমশই।

এখানে আর থাকা না, এবার এখান থেকে মানে-মানে পালানোই ভালো। অরবিন্দ আর হৃদয়নাথ নিজেদের মধ্যেই পরামর্শ করতে লাগলেন।

সে পরামর্শ শেষ হবার আগেই ঘটে গেল অঘটন। একদিন গভীর রাত্রে ব্যারাকবাড়িটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। নীচের মোটর-গ্যারেজ থেকে কিংবা রঙের দোকান থেকে আরম্ভ হয়েছিল আগুন।

সমস্ত বাড়িটা ছিল ঘুমিয়ে। হঠাৎ সমস্ত বাড়ি একসঙ্গে চিৎকার ও আর্তনাদ করে উঠল। উপর থেকে নামবার একটিমাত্র সিঁড়ি, বাইরে বেরিয়ে আসার একটিমাত্র দরোজা। ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, হুড়োহুড়ি।

ভয়ংকর শব্দে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে, সারা পাড়া উচ্চকিত করতে করতে দমকল এসে গেল অনেক। কিন্তু আগুন ইতিমধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে।

সমস্ত পল্লী ছুটে এসেছে এই দৃশ্য দেখতে। দমকলের কর্মীরা প্রাণপণ করে চেষ্টা করছে আগুন নেবাবার জন্যে এবং মানুষ-জনকে উদ্ধার করার জন্যে। সারাটা রাত্রি আগুনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলল দমকল।

সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে এই পল্লীর, এই বারিক লেনের। আজও তাদের কানে শব্দ করে ওঠে মাঝে-মাঝেই সেই দমকলের পাগলা ঘণ্টা।

অনেক মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে সেই আগুন। অনেককে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে, অনেককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হৃদয়নাথ, অরবিন্দ ঘোষাল, আরও কত লোক একেবারে উহ্য হয়ে গিয়েছে। বেঁচেছে হয়তো কয়েকজন, কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি না। সব রেষারেষি ভস্ম হয়ে গিয়েছে।

এখন দাঁড়িয়ে আছে সেই বাড়িটার কঙ্কাল। একটি দুর্ঘটনার সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারাকবাড়িটার কাঠামো।

॥ পাঁচ ॥

আমরা এবার চলে এলাম অন্য একটা কাহিনীতে, অন্য একটা পরিবেশে। একেবারে প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি আমরা। কিন্তু আমাদের এই চলে আসা সম্ভবত সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা চলে এসেছি কাশীপুরের কাহিনীতে। এ কাশীপুর কোথায়, সে কথা পরে হবে। আমরা এখন এইটুকু মাত্র জানি যে, এবার আমরা যে জায়গায় উপস্থিত হয়েছি, সে জায়গাটার নাম ঐ—নাম কাশীপুর।

এর নাম আপনারা অনেকে শুনে থাকবেন। বছর-কয়েক আগে এখানে ভয়ংকর একটা ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, সেই সূত্রে এর নাম জানা হয়ে গিয়েছে অনেকের।

কিন্তু মানুষের স্মৃতির কথা তুলে লাভ নেই। স্মৃতি জিনিসটা স্বয়ং মানুষের মতই বেইমান। ওকে বিশ্বাস করা যায় না।

এসব ভূমিকা বর্জন করে, আসুন আমরা আসল ঘটনায় পৌঁছে যাই।—

সাঁকোর নীচে নৌকো বেঁধে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হীরালাল। ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে মাথার উপর। অন্ধকার যেন গলে-গলে পড়ছে চার-দিকে। মাঝে-মাঝে নদীর জলে হীরালালের পা ঠেকছে। অন্ধকার এতই গাঢ় যে, নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে না হীরালাল। অন্ধকারের ফাটল দিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে দুটি তারা। ওই তারা দুটো যেন আকাশের দুটো চোখ।

পা দুলিয়ে-দুলিয়ে হীরালাল খেলা করছে নদীর জলের সঙ্গে। কত চিন্তা, কত ভাবনা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ইচ্ছে এক সঙ্গে এসে যেন হীরা-লালকে প্রলোভন দেখাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে।

ফ্রাস ফ্রাস ফস। অনেক কষ্টে এতক্ষণে সে জ্বালতে পারল ভিজে দেশলাই। বিড়ি ধরাল হীরালাল। কয়েকবার টান দিল প্রবলভাবে, দম দিয়ে নিজের শরীর তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করল বুঝি।

হীরালাল কাশল। আবার কাশল। কারও সাড়া নেই।

সরু-সরু ধারায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টি পড়ছে তার মাথার উপর। নিরিবিলিতে বসে-বসে সে ভিজছে। ভিজতে তার যেন কোনো আপত্তি নেই, কোনো কষ্ট নেই, কোনো অসুবিধেও নেই। তার

ভুরুর উপর জল জমছে, আঙুল দিয়ে চেঁছে সে জল সরিয়ে দিয়ে আবার বসছে শক্ত হয়ে।

অন্ধকারটা ভীষণ গাঢ়। কিন্তু অন্ধকারে তার অসুবিধেই বা কি। আকাশের দিকে তাকাল হীরালাল। অন্ধকারের ফাটলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তার মনে হল আকাশের চোখ দুটো কে বুঝি উপড়ে নিয়ে গেছে। ঐখানে ছিল আলোর ফিকে দুটো ইশারা, তাও উধাও হয়ে গেছে। অন্ধকারটা জমেছে এবার। তার বিড়ির ডগার আলো চারদিক আলোকিত ক'রে তুলছে মাঝে-মাঝে। নদীর জলে বিড়ির এক টুকরো আলো শতখান হ'য়ে যাচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। সহস্রাক্ষ হয়ে উঠছে ঢেউ। শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ছুড়ে ফেললো হীরালাল। চক্ করে শব্দ শুনলো জলে। বিড়ির আগুন মুহূর্তেই নিভে গেল। কিন্তু মাথার উপর ক্রমাগত যে জল পড়ছে সেই জলে ভিজেও তার বুকের আগুন নিভছে না কিছুতেই।

এখান থেকে কাশীপুর নদীপথে তিন মাইল। কাশীপুরের ইন্দিরার কথা ভাবছে হীরালাল। কী চোখ মেয়েটার! তিন মাইল পুরু অন্ধকার ভেদ ক'রে ইন্দিরার চোখের তারার আলো হীরালালকে যেন হাতছানি দিচ্ছে। হীরালাল যাবে। যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে বসে আছে হীরালাল। রাত আর একটু গভীর হোক। বৃষ্টির ঝাপটায় রাত আরো নিস্তেজ হয়ে আসুক। হীরালাল যাবে। অমন চোখের ডাক উপেক্ষা সে করে কী করে? হীরালাল আবার বিড়ি জ্বালালো। শরীরে সে উত্তাপ আনবার চেষ্টা করছে। অন্ধকারের মধ্যে হীরালালের চোখও হয়তো হিংস্র আক্রোশে জ্বলছে।

শহরে মনোহারী দোকান আছে হীরালালের। দোকানের অর্ধেক মালই সে উপহার দিয়েছে ইন্দিরাকে। কিন্তু ইন্দিরার হাতে তা পেঁৗছেছে কি না, হীরালাল সঠিক জানে না। সাবান পমেড পাউডার স্নো আর ক্রীম—অনেক উপহার। দূর থেকে দেখেছে সে তার চোখ। সে কি চোখ! শুধু চোখ যেন ও দুটো নয়। সাদা দুটি পদ্মের মাঝখানে দু'টি পুষ্ট ভ্রমর যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। মনোহারী দোকানদার হীরালাল। বামন হয়েও তার চাঁদে হাত দেবার সাধ হলো। কাশীপুরের জমিদার-কন্যার চোখের মায়ায় পড়লো হীরালাল। হীরালালের হৃদয়ের ফটোগ্রাফ নিলে হীরালালকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। ইন্দিরাকে সে চায় না, সে জানে ইন্দিরা তার নাগালের বাইরে। সে চায় তার চোখ। ঐ চোখ হাতছাড়া করতে কিছুতেই পারবে না হীরালাল।

নদীর কিনারেই ইন্দিরাদের বাড়ি। হীরালাল নদীতে নৌকো বেঁধে মাছ ধরার ছলনা করে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে ইন্দিরা একমনে নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর নৌকো বেঁধে হীরালাল অপলক তাকিয়ে থাকে

তার চোখের দিকে। সমস্ত আকাশকে সঙ্কুচিত ক'রে দুটি চোখের সীমায় বেঁধে নিয়েছে যেন ইন্দিরা। মনোহারী দোকানদার হীরালালের মনোহরণ করেছে ওই চোখের চাউনি।

ইন্দিরা রোজই হীরালালের রকম দেখে আর হাসে। তার হাসি দেখে হীরালাল আস্কারা পায়। ভালো হ'য়ে ব'সে সে ভালো করে তাকাবার চেষ্টা করে।

মহামায়াকে ইশারা ক'রে ডাকে ইন্দিরা, জিজ্ঞাসা করে, 'লোকটা কি চায় রে মহামায়া?'

দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হীরালালের দিকে চেয়ে থাকে। ভয় পেয়ে হীরালাল নৌকো নিয়ে পালায়।

দুজনে খিল খিল করে হাসে। হাসিটা অবশ্য শুনতে পায় না হীরালাল।

হীরালালের জীবন স্বপ্নময় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। ইন্দিরাকে সে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে স্বপ্ন-রচনা শুরু করেছে। হীরালাল তার দোকান-পাট সব বন্ধ ক'রে দিয়ে স্বপ্নরাজ্যে চ'লে যাবে ইন্দিরাকে নিয়ে। ঐ চোখ দুটি হবে তার জীবনের সেরা সঞ্চয়।

অন্তরের প্রেরণা প্রবল হলে কোনো বাধা সে মানে না। হীরালাল মহামায়াকে হাত করেছে। দূরের ঘাটে নৌকো বেঁধে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে সে মহামায়ার কাছ থেকে গল্প শোনে ইন্দিরার। মহামায়ার মারফৎ সে পাঠায় তার উপহার। এতেই হীরালালের কত নিকট মনে হয় ইন্দিরাকে।

মহামায়া বলে, 'বলেছি তোমার কথা তাকে।'

'কি বলে?' হীরালাল আবেগে এগিয়ে এসে বলে, 'কি বলে রে, মহামায়া?'

মহামায়া পাকা মেয়েমানুষ, ঝি-গিরি ক'রে ক'রে সে পোক্ত হয়ে গেছে, বলে, 'যা বলে তা বলতে বড় লাজ লাগে, ভাই।'

আবেগে ঝি-এর হাতই চেপে ধরে হীরালাল, বলে, 'লাজের আছে কি, বল্।'

কানে কানে ফিসফিস ক'রে কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে মহামায়া। আরো বলে, 'কিছু এনেছ আজ—স্নো, তরল আলতা?'

'এই নাও স্নো। আলতা আর কুমকুম কাল নিয়ে আসবো।'

কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ঘোর ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মহামায়া আনন্দে দুলতে দুলতে ঘরমুখো চ'লে যায়।

প্রত্যহ দূরের ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে নূতন নূতন উপহার নিয়ে যায়

মহামায়া। পায়ে আলতা পরে, মুখে স্নো পাউডার মেখে, কুমকুমের টিপ পরে মহামায়া আজকাল সাজছে।

ইন্দিরা বলে, 'এত সাজের ঘটা কেন রে, মহামায়া?'

'দাসী বলে কি সাজতে নেই? সাধ শখ কি ধুয়ে মুছে গেছে?' মহামায়া বুঝি একটু চটেই জবাব দেয়।

ইন্দিরা বলে, 'তা নয় রে। বলছি, এত তো সাজতিস নে আগে।'

এর কোনো জবাব দেয় না মহামায়া। হুটপাট ক'রে ঘরদোর ঝাড়ে, শব্দ ক'রে জানালা খুলে দেয়, ঘষে ঘষে আয়না মোছে। বিকেল হয়ে গেছে। এখন বড় তাড়াতাড়ি তার। আর বেশি দেরি করা তার চলবে না।

অজস্র মিথ্যে কথা বলে বলে হীরালালকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলেছে মহামায়া। হীরালাল এখন আর নিজেকে বামন মনে করে না, এখন সে ইন্দিরাকে পাবার আশা রাখে। ইন্দিরা যে হীরালালের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে উঠেছে, একথা জানতে তার আর বাকি নেই।

কিন্তু বড় কঠিন কথা আজ শোনাল মহামায়া। আজ সে এসে সংবাদ দিয়ে গেল যে, ইন্দিরার বিয়ে ঠিক। বিয়ে ঠিক? এ বিয়েতে মত দিল ইন্দিরা? এত বড় প্রবঞ্চনা?

মহামায়া বললো, 'মেয়েদের কথা আর বলো কেন?'

আক্রোশে প্রায় গর্জন করে উঠলো হীরালাল, বললো, 'তুমি বাধা দিতে পারলে না একটু?'

'বাধা?' মহামায়াও যেন ত্যক্ত হ'য়ে বললো, 'বাধা শোনার মতই মেয়ে বটে। বড়লোকের মেয়ে বড়লোক বর চায়। তোমায় দিয়ে যা দরকার ছিলো, মিটেছে তা।'

'কী দরকার ছিলো আমায় দিয়ে?' হীরালাল এত জোরে বললো যে, নদীর ওপার থেকে তার প্রতিধ্বনি বেজে উঠল। প্রতিধ্বনিটা যেন ব্যঙ্গ করে বললো, আমার বিয়ে।'

হীরালাল স্তব্ধ হয়ে বসলো। কোনো দিকে সে তাকালো না। চোখের সামনেই জোনাকিরা দপদপ ক'রে জ্বলে উঠে শুধু তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো সেই দুটি চোখের কথা। এত দর্প চোখের? এত অহঙ্কার? আচ্ছা। হীরালাল শক্ত হয়ে বসল।

মহামায়া সেজে-গুজে বয়সটা অনেক কমিয়ে নিয়ে রঙ্গিণী বেশে এসেছিল। একটু এগিয়ে বসে বললো, 'এর জন্যে মন খারাপ করছো কেন অযথা? আমার দিকে চাও। মুখ তোলো।'

হীরালাল মুখ তুলে বললো, 'কি?'

'কি? কিছুই বোঝ না তুমি?' মহামায়া হীরালালের আর একটু কাছে সরে বসলো, 'ওর কথা ভুলে যাও।'

হীরালাল হিংস্র সাপের মত গর্জে উঠে এক ছোবল দিলো মহামায়ার পিঠে। প্রচণ্ড চড় সেটা।

নৌকো থেকে মহামায়াকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিলো হীরালাল। প্রতিহিংসায় তার শরীর গরম হয়ে উঠেছে। সে প্রতিকার একটা চায়ই। এত অহঙ্কার চোখের?

বাস্তবিকই ইন্দিরার বিয়ে। মহামায়ার এ কথাটা মিথ্যে নয়। বিয়ের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে হীরালাল ততই হিংস্র হয়ে উঠছে। তবু মায়া। তবু সে তার নৌকোটা কাশীপুরের ঘাট থেকে একবার করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। দিনে অন্তত একবার তার কাশীপুরের দরিয়া ছুঁয়ে আসা চাই-ই। ওদিকে উদ্যোগ-আয়োজনের আভাস স্বচক্ষে দেখে আসে হীরালাল। আয়োজনের ঘটা যত জমে ওঠে, ততই সে হয়ে ওঠে মরিয়া।

আজ সে হয়েছে চরম মরিয়া। তাই ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অন্ধকার রাত্রে সে সাঁকোর নীচে নৌকো বেঁধে বসে আছে। পর পর পাঁচ-সাতটা বিড়ি জোরে টেনে শরীর একটু চাঙ্গা লাগছে তার। এবার সে নৌকো ছাড়লো। ধীরে ধীরে চললো হীরালালের নৌকো।

অপ্রশস্ত নদী। সাঁকো পেরিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে একটু এগোলেই ডানে মড়কখোলা—মহাশ্মশান। মহাশ্মশানও আজ শান্ত। এই দুর্যোগের রাত্রে দুর্ভোগ বাড়াবার জন্য আজ কেউ মরে নি। মানুষের একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে। কিন্তু মেয়েমানুষ—এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তার। তার মনোহরণ করে, তার মনোহারী দোকানের সব মাল ধীরে ধীরে হরণ করে, অবশেষে—। উত্তেজনায় জোরে বৈঠা ঠেলতে লাগলো হীরালাল। স্তব্ধ রাত্রে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে জলে। তার কানের মধ্যে উত্তেজনার গর্জন চলেছে, নদীর ছলাৎ শব্দ তার কানেই পেঁছচ্ছে না। তাকে যেতে হবে নিরিবিলি, নিঃশব্দে।

হঠাৎ খেয়াল হ'তেই হীরালাল থমকে গেলো। বৈঠার টান কমিয়ে সে চেপে বসলো। তার নৌকো তখন কাউনিয়ার মাঠের গা ঘেঁষে চলেছে। দূরে মহাশ্মশানের শেয়ালের ডাক শোনা গেল। ভোর হয়ে যাবে না তো ইতিমধ্যে? হীরালাল নৌকো একটু জোরে চালাতে লাগলো আবার।

তারপর?

ইন্দিরার সর্বনাশ ক'রে সগর্বে রাতের আঁধার দিয়ে আবার পালিয়ে গেছে হীরালাল। তার বিয়ের দফা সে শেষ করে দিয়ে এসেছে। চোখের অহঙ্কার দিয়েছে ঘুচিয়ে।

কাশীপুর জমিদার-বাড়িতে ডাকাতির গল্প চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই বীভৎস ডাকাতির গল্প শুনে গা শিউরে উঠলো সবার।

এরপর বহুদিন গত হয়ে গেছে। কাশীপুরের ডাকাতির কথা এখন তেমন মনে করে বসে নেই কেউ। কিন্তু অনূঢ়া ইন্দিরা এখনো অদ্ভুত দুটি চোখ নিয়ে দোতলার বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। এখনো তেমনি সে নদীর দিকে অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এতটুকু দুঃখ, এতটুকু বেদনা যেন তার জীবনে নেই। তার চোখে জল আসে না একটুও। তার জীবনের একটা শুভলগ্ন, তার জীবনের একটা শুভ স্বপ্ন নিমেষে যে চূর্ণ হয়ে গেছে—তার জন্যে সে যেন কোনো পরোয়াই করে না। ইন্দিরার চাল-চলন এখন আরো ধীর, আরো স্থির হয়েছে। অতি সন্তর্পণে সে প্রতিটি পদক্ষেপ করে। জীবনে একটা ধাক্কায় তাকে যেন আশ্চর্যরকম সতর্ক হয়ে যেতে হয়েছে।

ইন্দিরার বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সের ছাপ নেই তার মুখে, ছাপ নেই তার দেহে। জীবনের সংযম ও শৃঙ্খলা তার দেহের লাবণ্যকে ধরে রেখেছে। ইন্দিরা কথা বলে কম, হাসে কম, ভাবে বেশি। কি ভাবে সে? তা অবশ্য বলা কষ্ট। কিন্তু চিন্তার একটা স্রোত অহর্নিশ অন্তঃসলিলা ধারার মত তার মনের গভীরে যে বয়ে চলেছে, তা অবশ্য বোঝা যায় তার মুখের দিকে তাকালেই।

মহামায়াও আছে। বলে, 'একটা গান শোনাও দিদিমণি।'

দিদিমণি মুচকে হাসে, বলে, 'গান কি আমি জানি?'

'ইশ্, জানো না আবার! সেই যে—

চোখ গেল পাখী,
চোখ গেল পাখী,
আয় রে কাছে,
তোরে আমার বুকে
বেঁধে রাখি।

—সে গানটা?'

ইন্দিরা আবার হাসে, বলে, 'সেটা কি গান রে?'

'তবে কী সেটা?'

জবাব দেয় না ইন্দিরা।

মহামায়া বলে, 'তোমার যদি টুকটুকে একটা বর জুটতো দিদিমণি।'

'তাহলে কি হতো?'

'কি আবার হতো। তুমি সুখী হতে।'

'অত সুখে কাজ নেই আমার। সুখ আর চাই নে, মহামায়া। সুখ যদি হবার হত তাহলে হাতের কাছে এসে পিছলে যেত না।' ইন্দিরা মহামায়ার দিকে অপলক তাকিয়ে বলে। আরো বলে, 'যার বিয়ে একবার ভাঙে, আর তার বিয়ে হয় না।'

মহামায়া গা নাড়িয়ে বলে, 'মিছে কথা। বিশ্বাস করি না। আমাদের হরবোলা মাসীর মেজমেয়ে, তার বিয়ের বর ঠাস করে পড়লো আর মরলো, তারপর সাত মাস পরে তার চেয়েও ভালো বর তার জুটে গেল না? এখন সে হুলারহাটে ঘর বেঁধে পাকাপোক্ত সংসার করছে না? তোমারও বিয়ে হবে দিদিমণি, তোমারও বিয়ে হবে। আমার মন বলছে।'

মহামায়ার আবার মন! সেই মন আবার কথা বলে। হাসি পায় ইন্দিরার। কার সঙ্গে কার তুলনা। হরবোলা মাসীর মেজমেয়ে, আর কাশীপুরের জমিদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কি এক? রাগও হয় না, দুঃখও হয় না—হাসি পায় শুধু ইন্দিরার। ইন্দিরা মনে মনে হাসছিলো। এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো দুজনে। ব্যাপার কি? ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাবার মত তারা ভীত হয়ে উঠলো। আবার ডাকাত এলো নাকি?

ডাকাত নয়। বীরশাহীর রাজার ছোট ছেলে শিকারে বেরিয়েছে। কাশীপুর থেকে বীরশাহী প্রায় আড়াই শ' মাইল দূর। বীরশাহীর ছোট ছেলে মহীতোষ বড় উৎসাহী ও উদ্যোগী ছেলে। লেখাপড়াতে ছেলেটি যেমন ভালো, খেলাধুলাতেও তেমনি চৌকশ। একটু অ্যাডভেনচারাস ছেলে। বনবাদাড় ভালবাসে বেশি। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে কদিন আগে কাশীপুরে এসে হাজির হয়েছে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জঙ্গলে তাঁবু গেড়ে বন-বাদাড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে শুধু। শিকার যা করে সেটা অস্বীকারই করে সে। শিকার ক'রে মন তার ওঠে না। বাঘ-ভালুক শিকার সে ভালবাসে না। সে ভালবাসে পাখী আর হরিণ। বন্দুক, জলের ফ্লাস্ক আর ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়ানোতেই তার আনন্দ। দু'চারবার বন্দুক যা ছোঁড়ে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তার আওয়াজ বেশির ভাগই ফাঁকা আওয়াজ।

মহীতোষ বীরশাহীর গর্ব। এমন ছেলে বীরশাহীতে নাকি আর কেউ দেখেনি। এতটুকু অহঙ্কার নেই, বদখেয়াল নেই,—সবার সঙ্গে মিলতে মিশতে জানে, সবাইকে ভালবাসতে জানে। তাকে সবাই ভালবাসে যেমন,

তার নির্দেশও পালন করে তেমনি। সাঙ্গোপাঙ্গ যা সঙ্গে নিয়ে এসেছে মহীতোষ, তারা বড়লোকের মোসাহেব হিসেবে আসেনি, এসেছে বন্ধু হিসেবে। দলবল নিয়ে মহীতোষ কাশীপুরে টহল দিয়ে বেড়ায়। জায়গাটা বেশ ভালো লেগেছে মহীতোষের। গ্রামটির চারদিকে আকাশের বেড়া দেওয়া, আকাশ দিয়েই যেন গ্রামের সীমানা বাঁধা। সামনে অপ্রশস্ত নদী, পিছনে সুগভীর বন। তাছাড়া, গ্রামটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গাটা। এমন নিবিড় গ্রামে জমিদারের বাড়িটাও একটা দেখার জিনিস। মহীতোষের ভালোই লাগছে জায়গাটা।

নদীর কিনারে বসে সারা দুপুর খুটখাট করে ছবি তোলে মাঝিমাল্লার আর ল্যান্ডস্কেপের। বন্দুকটা শুইয়ে রাখে পাশে। ফ্লাস্ক থেকে চা বা জল ঢেলে চুক চুক করে খায়।

গ্রামের লোকেরা মহীতোষের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। বেশ ভালো লাগে হয়তো তাদেরও। চটপটে ছেলে, সুশ্রী চেহারা, বুদ্ধির দীপ্তি চোখে মুখে। মহীতোষ খেয়াল হলে গ্রামের লোকের ছবি তুলে নেয় দু-চারটে।

নদীর ওপার থেকে অর্ধবৃত্তাকারে দল বেঁধে উড়ে আসছে একপাল বুনো হাঁস। ক্যামেরা নামিয়ে রেখে বন্দুক তুলে নিলো মহীতোষ। নিশানা ঠিক করে গুলী ছুঁড়ল বটে, কিন্তু লেজ ঝাপটা দিয়ে পালিয়ে গেল বুনো হাঁসের দল। আবার একটা গুলী ছোঁড়ার মতলবে মহীতোষ ভালো করে নিশানা করতে গিয়েই থমকে গেল।

কী ভয়ঙ্কর একজোড়া চোখ! এমন চোখ তো কোনোদিন দেখে নি মহীতোষ। শুভ্র নির্মল নিষ্কলঙ্ক দুটি চোখ। অনেক হরিণ মেরেছে মহীতোষ, ভালো করে দেখেছে তাদের চোখ,—কিন্তু কোথায় লাগে তারা। মহীতোষ বন্দুক নামিয়ে রেখে ওই দিকে তাকালো।

ইন্দিরা দোতলার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এইদিকেই তাকিয়ে আছে। মহীতোষ চোখ নামিয়ে ঘুরে বসলো নদীর দিকে মুখ করে।

দলবল নিয়ে তাঁবুর দিকে যাত্রা করলো মহীতোষ। কিন্তু তাঁবুতে শুয়েও মন তার স্থির থাকতে চায় না। সে জানে, রাত্তির বেলা নদীর কিনারে গিয়ে বসলে রেলিঙে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখ দেখতে পাবে না সে। তবুও এ কী আকর্ষণ! নিমেষের সেই দেখাটা অনিমেষ দুটি চোখ দিয়ে তার দিকে যেন এই অন্ধকার ভেদ করেও তাকিয়ে আছে।

দলবল থেকে মহীতোষ বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়। সে থাকতে চায় একা, সে বেড়াতে চায় একা। মহীতোষের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে চমকালো সবাই। দল-ছাড়া হতে জীবনে যে রাজী ছিল না, সে চায় দলভ্রষ্ট হতে?

অক্ষয় বললো, 'এর হেতু কি মহীতোষ?'

অনাথ বললো, 'হঠাৎ এমন বদলে যাবার মানে?'

জবাবে মহীতোষ বললে, 'বড় বড় ডাকাতরাও সাধু হয় একদিন। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমি একা থেকে দেখতে চাই সত্যিই আমি একা থাকতে পারি কি না।'

নীলাম্বর বললো, 'এ ঠিক মরি কি না-মরি পরখ করে দেখার জন্যে মারাত্মক বিষ খাওয়ার মত শোনাচ্ছে। যদি সন্ন্যাসী হ'তে চাও তো বলো। কিছু না হয় ইনভেস্ট করি। একটা চিমটে, একটা কমণ্ডলু আর একটা কম্বল না হয় কিনে আনি।'

রসিকতা ভালো লাগছে না মহীতোষের। বললো, 'ইয়ার্কি রাখ্। আমি চললাম, তোরা রাত্রের খাবার জোগাড় কর। পারিস তো দু'একটা বুনো হাঁস মেরে নিয়ে আয়, রাত্রে ফীস্ট করা যাবে।'

নদীর দিকে পিঠ দিয়ে মহীতোষ অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় বসে রইলো। কই, কেউ তো আসে না ওই রেলিঙে দাঁড়াতে। মহীতোষ জমিদার-বাড়ির দিকে তাকাতে লাগলো কেবলি। ওই তো আসছে। মহীতোষের বুকের আন্দোলন দ্রুত হ'ল। দুবার ঢোক গিললো মহীতোষ। মেয়েটা রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ালো নদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। মহীতোষ দেখতে লাগলো কেবল। কোনো ইশারা নেই, ইঙ্গিত নেই, কোনো সাড়া নেই। দু' তরফ থেকে শুধু অপলক তাকিয়ে থাকা।

মাথার নীচে দু' হাত রেখে পায়ের উপর পা তুলে চিৎপাত হয়ে তাঁবুতে শুয়ে মহীতোষ গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করে। এ ভাবান্তর কিসের জন্যে? কেউ কিছু বুঝতে পারে না। দু'চারদিন এইভাবে কাটাবার পর অক্ষয় আর অনাথ ঠিক করলো, ব্যাপারটা কি জানতে হবে। ফলো করতে হবে মহীতোষকে।

পরদিন রাত্রে যথানিয়মে মহীতোষ যখন মাথার নীচে দু'হাত রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে চিৎপাত হয়ে তাঁবুতে শুয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়েছে, তখন অক্ষয় তার পায়ে একটা চিমটি কেটে বললো, 'লাগে? জ্ঞান তাহলে আছে। চেতনা তাহলে একেবারে যায় নি।'

পা থেকে পা নামিয়ে মহীতোষ বললো, 'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ জানি। কি করতে হবে আমাদের, আদেশ কর।' বললো অনাথ।

মুচকি হেসে উঠে বসলো মহীতোষ। জেনেই যখন ফেলেছে, তখন আর গোপন করে লাভ কি? মনের কথা অকপটে প্রকাশ করলো মহীতোষ।

অক্ষয় বললো, 'পাখী শিকারে বীতরাগ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। সাকী

চাই? বেশ। বেশ। আদেশ শিরোধার্য। সব ব্যবস্থা হচ্ছে।'

মহীতোষের মনের গুমোট ভাবটা পলকে কেটে গেল। এদিকে অক্ষয় অনাথ আর নীলাম্বর উঠে পড়ে লেগে গেলো। বীরশাহীতে খবর গেলো, কাশীপুরের জমিদার-বাড়িতে পোঁ ধরলো শানাই।

মহামায়া ইন্দিরাকে বললো, 'মন আমার মিছে কথা কয়নি দিদিমণি।'

মহীতোষের মত ছেলে যখন মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলেছে, তখন আর কথা কি? কারো কোনো কথা, কোনো আলাপ-আলোচনা কিছুরই দরকার নেই আর। জমিদার-ঘরের মেয়ে যাবে রাজার ঘরে। এর মধ্যে আর ভাববার আছে কি?

ইন্দিরার বাবা অক্ষয়কে বললেন, 'কিন্তু একটা কথা আছে।'

'কি কথা?'

'এর আগে একবার বিয়ে ঠিক হয়েছিল মেয়ের।'

'বাস্, বাস্। হয় নি তো সে বিয়ে? তবে ঠিক আছে।' অক্ষয় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে করে রাত্রেই তারা সদলবলে নৌকোয় চেপে চললো জংশন স্টেশনের দিকে। সেখানে ট্রেন রাত চারটেয়। পরদিন সন্ধ্যের পর বীরশাহীতে তারা পেঁাছবে।

ইন্দিরা নববধূ-বেশে অলঙ্কারে ও ওড়নায় আবৃত হয়ে চললো শ্বশুর-বাড়ি, সঙ্গে সহযাত্রিণী মহামায়া। মহামায়ার অহঙ্কার কত! তার মন মিছে কথা কয় না। বর জুটেছে সোনার চাঁদ ছেলে। হীরালালের আস্পর্ধার কথা ভাবে মহামায়া। সাহসের বহর বটে।

বীরশাহীতে বর-বউ পেঁাছতে রাত হয়ে গেল অনেক। বক্রী অনুষ্ঠান যা-কিছু সব হবে পরদিন সকালে। আজ বাসর-রাত তাদের। আজ তাদের প্রথম মুখোমুখি দেখা হবে, প্রথম মধুর সম্ভাষণ হবে। রাজবাড়ির ফটকে নহবৎ বেজে চলেছে একটানা।

মানসিক উত্তেজনা, নৌকো আর ট্রেনের ধকল, খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম —সব মিলিয়ে মহীতোষ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ইন্দিরা যখন বাসর-ঘরে ঢুকলো তখন মহীতোষ ছেলেমানুষের মত জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমচ্ছে। ইন্দিরা লজ্জায় কুঁকড়ে এক পাশে ছোট হয়ে শুয়ে পড়লো। মহীতোষের পাশে তাব আকাঙ্ক্ষিত একজোড়া চোখ চুপে চুপে এসে যে শুয়ে আছে, তা জানে না মহীতোষ। বন্ধুভাগ্য আছে বটে মহীতোষের। অক্ষয়-অনাথ আর নীলাম্বর না থাকলে বিয়েটাই তার হতো না। তারা কম করেছে নাকি কিছু? মহামায়া ইন্দিরার হাত ধরে ধরে এগিয়ে দিয়েছে, আর

এই তিন বন্ধু—যাতে একটুও অসুবিধে না হয় ইন্দিরার, তার দিকে নজর রেখেছে পুরোপুরি।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলো মহীতোষের। মহীতোষ উঠে বসে ইন্দিরার গায়ে হাত বুলালো। নড়লো না ইন্দিরা। ইন্দিরাও ক্লান্ত কম নয়। সেও ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। মহামায়া দরজার বাইরে শুয়ে আছে উৎকণ্ঠ হয়ে।

ইন্দিরা ঘুমচ্ছে। তার ক্লান্ত নিশ্বাসের শব্দ বাজছে মহীতোষের কানের কাছে। একটু জাগিয়ে দুটি কথা বলার ইচ্ছে হলো মহীতোষের, কাছ থেকে ভাল করে দেখতে ইচ্ছে হলো মহীতোষের,—কাছ থেকে ভাল ক'রে দেখতে ইচ্ছে হলো দুটি চোখ।

ঘরে আলো জেবলে নিল মহীতোষ। আলো জেবলেই সে চমকে উঠলো। ঘুমন্ত মানুষ এমন করে চেয়ে থাকে? প্রকাণ্ড দুটি উজ্জবল চোখে পুরোপুরি তাকিয়ে ঘুমচ্ছে ইন্দিরা। তার চোখ দুটি কপট ও কঠিন হয়ে চেয়ে আছে মহীতোষের দিকে। মহীতোষকে যেন পরিহাস করছে চোখ-দুটি। পাথরের মত শক্ত দুটি দৃষ্টির দিকে মহীতোষ হতভম্বের মত চেয়ে রইলো।

॥ ছয় ॥

কোন্ কথা দিয়ে আমরা কথারম্ভ করেছিলাম, আজ বুঝি আমরা তা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। কোন্ পথ ধরে-ধরে কোথায় গিয়ে আমরা পেঁাছব, তার নিশানাই বুঝি হারিয়ে গিয়েছে আমাদের।

হারিয়ে যাক্, কিন্তু হেরে যেতে আমরা কিছুতে রাজি না। আমরা নূতন উদ্যমে আবার অন্বেষণ করব আমাদের কাহিনী। যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে সুতো, আবার আমরা গ্রন্থি বেঁধে নেব সে সুতোয়—সূত্রটাকে বর্জন করতে আমরা রাজি হব না।

জীবনে পরাস্ত হতে রাজি হতে চায় কে?—সম্ভবত কেউ না। আমরাও ও-ব্যাপারে রাজি হতে রাজি না। কিন্তু তবুও পরাস্ত হতে হয় অনেককেই। দেখি, আমরাই-বা কিভাবে পরাস্ত হতে পারি।

ব্যর্থতারও বাহাদুরি একটা নাকি আছে। ব্যর্থ তো সকলে হতে পারে না, যে ব্যর্থ হয় তার পক্ষে এইটেই একটা বাহাদুরির কথা। সাফল্যলাভ যার ভাগ্যে ঘটে, সে বাহাদুর বটে; আর পাঁচজনকে ডিঙিয়ে সে এগিয়ে গেল—এটা সামান্য কথা না। আর, যার সাফল্যলাভ ঘটল না, সেও যে বিশজনকে ডিঙিয়ে পিছনে পড়ে রইল—সেইটেই বা তবে সামান্য কথা হবে কেন।

কিন্তু ও-কথা নিয়ে তর্ক আমরা না করলাম। যারা সফল হল, এবং সফল যারা হল না—তারা এ বিষয় নিয়ে ইচ্ছে হলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করুক। সে দ্বন্দ্বে আমরা যোগ নাই-ই বা দিলাম।

আমাদের এ কাহিনীর কেই-বা নায়ক, এবং কেই-বা নায়িকা—অকপটে স্বীকার করব—সে কথাটাই আমরা ভুলে গিয়েছি। এবং মনে হয়, যাঁরা এ কাহিনী এতক্ষণ অনুসরণ করে এসেছেন তাঁরাও ঠিক বুঝতে পারেননি, কে আমাদের নায়িকা এবং কেই-বা আমাদের নায়ক। অথচ, মনে হচ্ছে, যেসব নারীপুরুষকে অতিক্রম করে আমরা এলাম, তাঁদের মধ্যের কেউ আমাদের নায়ক-নায়িকা হবেন, এবং তাঁদের মধ্যের কারো জীবন নিশ্চয় কোনো কারণে ব্যর্থ হয়ে থাকবে। তা না হলে সহসা আমাদের মনে ওসব প্রশ্ন উঠবে কেন; ব্যর্থতার পক্ষে দু-চারটি কথা বলার উৎসাহই বা আমাদের কেন হবে। নিশ্চয় ওদের মধ্যের কেউ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবে এবং নিশ্চয় কারো প্রতি আমাদের মমতা জন্মে থাকবে,

সহানুভূতিও হয়তো হয়ে থাকবে কারো জন্যে।

কিন্তু সে যে কে, কিংবা তারা যে কারা—সে কথা প্রকাশ করে বলার যাতে সুযোগ পাওয়া যায়, তারই চেষ্টায় নূতন উদ্যমে তাদের অন্বেষণে রত হতে হল।

অন্বেষণে তো রত হয়েছে ওরাও—আমাদের নাটকের সেই দল। এক হাওয়া-গাড়িতে চেপে তারা যাত্রা করেছে কিসের যেন সন্ধানে। কিসের সন্ধানে তা অবশ্য আমরা জানি। তারা রওনা হয়েছে তাদের নাটকের উৎসের সন্ধানে।

ছয় জনে চেপেছে একটা গাড়িতে, ছয় জনে চলেছে একসঙ্গে—সে কথা আমাদের অবশ্যই মনে আছে। মসৃণ দ্রুততায় চলেছে তাদের গাড়ি কিসের সন্ধানে, কিসের অন্বেষণে? তারা স্বচক্ষে দেখতে চলেছে সেই অচিন-পুরী—স্নেহাংশুর নাটকের সেই উৎসভূমিটি।

গাড়িতে আছে ছয়জন—স্নেহাংশু, মনোজ, হরেশ, দীপক, নীহার এবং এই পাঁচজনের দলে একমাত্র নারী—দিবা। পঞ্চপাণ্ডবসহ এ বুঝি নূতন যুগের দ্রৌপদী।

সে নিজে দ্রৌপদী কি না দিবা অবশ্য তা জানে না। কিন্তু দলের পাঁচজনই তাকে দ্রৌপদী বলে মনে করতে বেশ আরাম ও আনন্দই যেন পায়। এত আনন্দ পায় বলেই তারা এমন আঁট হয়ে বসে এভাবে চলতে বেশ ফুর্তিই বুঝি পাচ্ছে।

তারা এই অভিযানে বের হয়েছে বটে, কিন্তু এর জন্যে তাদের কেউই তেমন প্রস্তুত ছিল না। আমরা তাদের যখন অচিনপুরীর রিহার্সেলে রত দেখে এসেছি মোমিনপুরের সেই প্রাচীন অট্টালিকায়, তখন তারাও যেমন এ রকম একটা অভিযানের সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেনি, আমরাও তখন তাদের এ উদ্যোগের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারিনি।

কিন্তু জীবনটাই যখন নাটক, তখন জীবনে এ-ধরণের ঘটনার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভালো।

ওদের রিহার্সেল সমাপ্ত হয়েছিল। বার-তিনেক নাটকটি মঞ্চস্থও তারা করেছে। তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে আমরা যখন অন্যত্র চলে যাই, তারপর একটি বছর গত হয়ে গিয়েছে; একটি শীত কেটে গিয়ে আর একটি শীতকাল এসে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যেতে পারত, কিন্তু খুব বেশি কোনো ঘটনা ঘটেনি, মাত্র তিনবার তারা মঞ্চস্থ করেছে নাটকটি। সুখ্যাতিও লাভ করেছে তাদের নাটক। সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছে অবশ্য দুজন—নাট্যকার স্নেহাংশু ও নাটকের নায়িকা দিবা।

নাটকটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেনি বটে, কিন্তু লোক-পরম্পরায় শোনা যাচ্ছে যে, অপরূপ অভিনয় করেছে নাকি ঐ মহিলাটি—যার নাম দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং নাট্যকার যিনি, সেই স্নেহাংশু বিশ্বাস নাকি অপূর্ব কৌশলে রচনা করেছে এই নাটকটি। রিহার্সেলের সময়ে অবশ্য আমরা নাটকটির দু-একটি দৃশ্যের কিছু-কিছু অংশের নমুনা দেখেছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্য, এর বেশি দেখার সুযোগ আমাদের ঘটল না।

তা না ঘটুক, তাতে আমাদের আক্ষেপ নেই। আমাদের যেটুকু দেখার আমরা তা দেখে নিয়েছি; যেটুকু আমাদের জানবার সেটুকু জেনে নিয়েছি আমরা। যেটুকু আমাদের জানা হয়নি তা জানার জন্যে পুনরায় আমরা ফিরে এসে তাদের সঙ্গ নিয়েছি।

দিবা নাকি বড় অদ্ভুত মেয়ে, প্রাণ সমর্পণ করে অভিনয় সে করে, সেই জন্যেই যেমন তার অভিনয় হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, তেমনি অফুরন্ত নাকি তার কৌতূহল।

প্রত্যেকবার অভিনয়ের পরে যখন যবনিকা পড়ত তখন সাজঘরের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে সে নাকি বলত, 'আমি দেখব তাকে—আমি দেখতে চাই ওই মেয়েটিকে।'

'কাকে? কাকে?' ঝুঁকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করত স্নেহাংশু।

এগিয়ে এসে দাঁড়াত মনোজ, হরেশ ছুটে এসে বলত, 'কি, কি?'

উত্তরে দিবা বলত, 'দেখতে চাই ওই মেয়েটিকে।'

মনোজ হরেশের দিকে তাকাত, হরেশ তাকাত স্নেহাংশুর দিকে; আর, একটু তফাৎ থেকে একদৃষ্টে দিবার দিকে চেয়ে থাকত নীহার।

কোন্ মেয়েকে দেখতে চায় দিবা প্রথমে তারা কেউ তা ধরতে পারে না। কিন্তু বারকয়েক দিবার এই প্রশ্ন শুনে তারা যখন ভালো করে জানতে চাইল, কি দেখার তার ইচ্ছে, কোন্ বিশেষ মেয়েটিকে দেখার তার সাধ তখন দিবা খুলে বলল তার মনের ইচ্ছেটা।

যার ভূমিকায় সে অভিনয় করছে, সে দেখতে চায় তাকে। অচিনপুরীর সেই অধিবাসিনীকে দেখতে চায় দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্নেহাংশু হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'তাকে দেখে কি হবে? সে তো একটা ছায়া মাত্র, সে তো একটা মায়া—সে আমার স্বপ্ন।'

স্নেহাংশুর চোখের দিকে চেয়ে দিবা হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'কবিত্ব থাক্-না এখন। আপনি স্বপ্ন দেখতে পারেন, আমরা পারি নে?'

একটু কবিত্ব করার চেষ্টা করে স্নেহাংশু বলেছিল, 'আপনার স্বপ্ন আপনি দেখুন, আমার স্বপ্ন আমারই থাক্-না।'

'আমার কোনো স্বপ্ন নেই।' একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিবা বলেছিল, নিজের কোনো স্বপ্ন যখন নেই, অন্যের স্বপ্নটাই তখন একটু দেখে নেওয়া যাক্-না।'

চিন্তা করে দেখে তার বুঝি মনে হল যে প্রস্তাবটা মন্দ না। একদা একটি মেয়ে দূর থেকে তার চোখে স্বপ্নের যে কুজ্ঝটিকা ছুড়ে দিয়েছে, এবং তার ফলে সে রচনা করে তুলেছে যে নায়িকা,—এই উপলক্ষে একবার গিয়ে কাছ থেকে তাকে দেখে এলে মন্দ হয় না।

হরেশ একটু উৎসাহ দেখাল, বলল, 'ঠিক। ফুল্লরাকে দেখতে চাই আমরা।'

যে মেয়ে-দুটি ললনার ও মাধুরীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছে, তারা দুজন পাশে দাঁড়িয়ে মুখের পেণ্ট মুছছিল, এদের এই প্রস্তাব শুনে তারা বুঝি একটু ক্ষুণ্ণই হল। আগের কথাগুলো এরা শোনে নি, হঠাৎ এসে শেষ কথাটা শুনে নিজেদের বড়ই ছোট বলে মনে হল এদের।

অভিনয় হচ্ছে অভিনয়। মঞ্চে যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তুমি রানী, আমি বাঁদী। কিন্তু মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর তো সবই একাকার।

অথচ, এরা যেরকম কথা বলছে তাতে যেন তাদের মনে হচ্ছে, ললনারা বুঝি এখনো ফুল্লরার চেয়ে অনেক খাটোই। ফুল্লরাকে দেখার জন্যে ওরা পাগল, কিন্তু পাশেই যে এসে দাঁড়িয়েছে আরো দুটি ললনা, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবার বুঝি কোনো গরজ নেই ওদের! মুখের রং মুছতে-মুছতে ওরা সরে গেল।

নীহার তার সাজ বদল ক'রে এদের কাছে এসে সব বৃত্তান্ত আগে শুনে নিল, তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে বলে উঠল, 'ইয়েস। ফুল্লরাকে চাই।'

এই সুযোগে এইভাবে কথাটা বলতে পেরে বেশ রোমাঞ্চ বোধ করল সে। এখানে এখনো ফুল্লরা বেশেই ফুল্ল হয়ে বসে আছে দিবা। সুতরাং, নীহার যেন তার মনের কথাটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। একটু হেসে নিল সে, নিজেকে একটু শুধরেও নিল, বলল, 'তার মানে আমরা দেখতে চাই সেই মেয়েকে—সুতরাং এ প্রস্তাবটা অতীব উত্তম।'

কথাকে যত টানা যায় কথা ততই বেড়ে চলে, সেইজন্যে একে দ্রৌপদীর বস্ত্রও যেমন বলা যেতে পারে, কথাকে যতই গড়িয়ে দেওয়া যাবে ততই আকারে এ বড় হয়ে ওঠে, সুতরাং একে তুষারের বল বলাও যেতে পারে। এ'কে যে আখ্যাই দেওয়া হোক ওদের প্রস্তাবের কথাটা ক্রমশ বেড়ে চলল।

অচিনপুরী নামক স্নেহাংশুর স্বপ্নের সেই ভবনটি ক্রমশ ওদের কাছে

হয়ে উঠতে লাগল স্বপ্নিল একটা মঞ্জিল। সেটা চাক্ষুষ দেখার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল তারা। সেটা দেখে আসার যে প্রস্তাবটা তুলেছে ঐ দিবা দেবী তার জন্যে সকলে তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে লাগল।

মেয়েটার বোধ আছে, বুদ্ধি আছে, কৌতূহল আছে, মেয়েটার প্রাণে প্রেরণা আছে। এ মেয়ে সাধারণ কোনো মেয়ে যেন নয়, এ মেয়েটির যেন ভীষণ একটা প্রতিভাই আছে—এই রকম নানা কথা বলাবলি করতে লাগল তারা।

ওদের স্তুতি শোনে, ওদের প্রশস্তি শোনে—কিন্তু দিবার মুখে ওসবের কোনো প্রভাবই বুঝি পড়ে না।

অভিনেত্রীর জীবন তার। জীবনটা তার কাটছে অভিনয় ক'রে করেই। কি নজরে তাকে সকলে দেখে তা তার স্পষ্ট জানা আছে। বহু প্রশস্তি সে শুনেছে, বহু নিন্দাও শুনেছে সে—সুতরাং লোকের কথায় কান দিয়ে লাভ কি! কথা যদি কানে এসে পেঁাছে যায়ই, তবু সে থাকে নির্বিকার।

এক-এক বার তার নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়—তার বোধ একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল কি না। কত আবেদন-নিবেদন তাকে শুনতে হচ্ছে, কত ইশারা-ইঙ্গিত দেখতে হচ্ছে তাকে চোখে। মনে-মনে জানে দিবা। তার মনের নেপথ্যে ওসব কি সাড়া তোলে না একটুও?

কিন্তু ওসব কথা থাক্। তার মন এখন ব্যাকুল হয়েছে সেই মেয়েটিকে দেখার জন্যে। যাকে দেখে রচিত হল একটা নাটক, সে মেয়ে নিশ্চয় সামান্য মেয়ে না। নিশ্চয় অসীম শক্তি তার আছে। সেই শক্তিটা সে দেখে আসতে চায়।

দিবার কাছে ব্যাপারটা প্রথম থেকেই বড় মজার লাগছে। রিহার্সেল দেবার আমল থেকেই। নাটকটার প্লট নাট্যকার পেয়েছে কোথা থেকে—একথা শোনার পর থেকেই তার মনে জেগে উঠেছে কৌতূহল। কিন্তু নিছক কৌতূহলই হয়তো এটা নয়—এটা বুঝি একটা আগ্রহও। একটি মেয়েকে দেখেই তাকে নিয়ে তৈরি হয়ে গেল একটা কাহিনী—এ ঘটনা লেখকদের হাতে ঘটছে হয়তো আকছারই; কিন্তু যাকে নিয়ে হোক কোনো-একটা কাহিনী তৈরি হয়ে উঠলেই তাকে দেখার আগ্রহ জাগাও স্বাভাবিক। দিবার মনে সেই স্বাভাবিক আগ্রহই হয়তো জেগেছে।

কিন্তু এতদিন সে সেই স্বাভাবিক আগ্রহটাই অস্বাভাবিক চেষ্টায় চেপে ছিল। নাটকের উৎসটা দেখার কথা তুললে যদি কেউ কোনোভাবে ভুল বোঝে, সেইজন্যেই সে চেপে ছিল। কিন্তু কয়েকবার এটি মঞ্চস্থ হবার সুযোগে এদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করার ফলে এদের সঙ্গে

একটু অন্তরঙ্গতা হওয়ায় দিবা বেশ স্বাভাবিকভাবেই দাখিল করতে পেরেছে তার প্রস্তাব।

এখন মাঝে-মাঝেই তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা হয় মাঝে-মাঝে।

এবং দিবা বুঝতে পারে, ওরা প্রত্যেকেই তার সঙ্গে আলাদাভাবে একটু ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে যেন ব্যাকুল। দিবা বুঝতে পারে, দিবা মনে-মনে হাসে। হাসে বটে সে, অথচ সেটা যেন তার সত্যিকারের হাসি না। ওদের চোখে নিজেকে দেখার চেষ্টা করে সে, ওরা তাকে কি ভাবে তাও সে বুঝতে পারে। ওদের উপর সেজন্যে সে রাগ করে না অবশ্য। সত্যিই তো, রাগ সে করবে কেন, ওদের দোষই বা কি। সে তো একজন অভিনেত্রী মাত্র, সে তো—যাকে লোকে বলে—একজন নটীই।

কিন্তু ওদের মনে পুলক আছে। বিশেষ করে নীহারের, দীপকের আর হরেশের। ওদের ধারণা হয়েছে যে, ওরা অনেক নিকটে এসে গেছে দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ওদের কথাবার্তায় চালচলনে তাই সামান্য একটু অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। সবার সামনে দিবার সঙ্গে কথা বলার সময়ে ওরা তিনজনই কেমন একটু-যেন হেঁয়ালি-হেঁয়ালি কথা বলে। সে সব কথার মানে দিবা সব সময় ধরতে পারে না. সে সব কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত তাও সব সময় বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে পারে, ওদের মোটামুটি চাহিদাটা কি।

চাহিদা কি, সেটা খুলে বলতে দোষ কোথায়? এটুকু সাহস পুরুষ-মানুষের থাকা কিন্তু উচিত। অথচ থতমত খেয়ে আসল কথাটা হারিয়ে ফেলে অনবরত ঢোক গিললে কেবল করুণা করতেই ইচ্ছে করে।

দিবা বুঝি ওদের করুণাই করছে।

সকলের সঙ্গে সমান ফুর্তিতে কথা বলে দিবা। কিন্তু ওরি মধ্যে, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—দিবা যেন নীহারকে একটু এড়িয়ে চলতে চায়। নীহারের মধ্যে একটু ফায়ার অবশ্য আছে, ফায়ার ব্রিগেডে সে কাজ করে বলেই বুঝি নিজের মধ্যে সে জমিয়ে তুলেছে একটু ফায়ার। তার মধ্যে একটু তাপ আছে বলেই কি দিবা তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকে? এর উত্তর আমরা চাইব না, এবং চাইলেও এর উত্তর হয়তো দিবা দেবীও দিতে চাইবে না।

জীবনটা বড় জটিল ব্যাপার। এড়িয়ে যাবার চেষ্টাকেও অন্য মানে করা যায়। এবং নীহার সেই মানেই করে নিয়েছে, নীহার ভালো মতই [illegible] নিয়েছে অভিনেত্রী দিবা তার জীবনের নায়করূপে নির্বাচন করে

নিয়েছে তাকেই, এবং এইজন্যেই সহজভাবে তার সঙ্গে মিশতে তার এই জড়তা।

সুতরাং নীহার বিন্দুবিসর্গ দুঃখিত নয়। বরঞ্চ নীহার যেন একটু গর্বিতই। সে গর্বিত, তাই সে একটু আলাদা থাকতে ইচ্ছে করে, এবং একটু আলাদাভাবে দিবার সঙ্গে মেশবার জন্যে চেষ্টাও ক'রে থাকে।

মোমিনপুরের রিহার্সেলের ঘরটাই তাদের জমায়েত হবার জায়গা। এখানেই তারা মিলিত হয়ে থাকে। একটা নাটক এতটা সফল যখন হয়েছে, তখন নতুন একটা প্লট নিয়ে নতুন আর-একটা নাটক লেখবার ইচ্ছে তাদের আছে। এবং এমন উচ্চ শ্রেণীর এই অভিনেত্রী যখন পাওয়া গিয়েছে তখন একে আর ছাড়া না; এর সঙ্গে নিয়মিত যোগ রাখাটা খুবই দরকার। এই রকম ভেবে-চিন্তে তারা এই ঘরটা আর হাতছাড়া করে নি। এখানে এসেই জমায়েত হচ্ছে তারা। এবং এখানেই সকলের সঙ্গে দিবার, এবং দিবার সঙ্গে সকলের দেখাশুনা কথাবার্তা হয়ে চলেছে নিয়মিত।

অমিয় স্নেহাংশু রেবতী মনোজ বিকাশ হরেশ দীপক নীহার বীরেন—এই নবরত্ন এসে জমায়েত হয় এখানে। অচিনপুরী নিয়ে আলোচনা হয়। এবং আলোচনা হয়—

নীহার বলল, 'এই কন্যাটিও কিন্তু ভাই এখনো অচিন রয়ে গেল। একে চেনা গেল না এখনো। কি রকম একটা যেন রহস্য, একটা হেঁয়ালি, একটা কুজ্ঝটিকা।'

নাটক করে-করে অনেক কথা শিখে ফেলেছে ওরা, সেজন্যে অনর্গল লাগসই কথা ব্যবহারে ওদের কোনো বাধা নেই।

গলাটা সাফ করে নিয়ে দীপক বলল, 'ঠিক। কুয়াশাই বটে। আমাদের মনেও একটু কু-আশাও যেন আছে মনে হচ্ছে!'

নীহার জিভ কাটল, বলল, 'ছি। একজন নারী উনি—'

মনোজ আর রেবতী মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। তারা বুঝি একটু তামাশা উপভোগ করছে। কিন্তু কিছু বলল না। একসঙ্গে এরকম কয়েকজন পুরুষ এভাবে বসলে ও-ধরণের একটা মেয়েকে নিয়ে এ-ধরণের একটু আলোচনা হবেই। সুতরাং এ সবে বাধা দেওয়ার কোনো দরকার মনে করল না তারা। বাধাও দিল না, উস্কেও দিল না। মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে গেল।

হরেশ কি-যেন বলি-বলি করছিল, এবারে বলল, নীহারের দিকে চেয়ে একটু হেসে নিল, তারপর বলল, 'জিভ ত' খুব কাটছ, কিন্তু জিভের তো বিরাম নেই। ঐ জিভ নেড়ে-নেড়ে কতবার ওর নাম উচ্চারণ করেছ, একবার

ভেবে দেখ দেখি। আর, বলব তবে খুলে—'

সকলেই ব্যগ্র হয়ে উঠল, একটা ভীষণ গোপন কথা শোনার জন্যে ওরা সকলে উৎসুক হয়ে উঠল, বলল, 'কি কি, শুনিই-না।'

হরেশ বলল, 'ঐ জিভে জল গড়াচ্ছে কতটা?'

অট্টহাস্য করে উঠল স্নেহাংশু অমিয় রেবতী।

এই আসরে এসে থাকে দিবা। আজও তার আসার কথা। কিন্তু সে এসে পৌঁছচ্ছে না। তার জন্যে এরা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু নীরবে তো আর অপেক্ষা করা যায় না, সুতরাং তারা তার সম্বন্ধেই নানা রকম কথা বলে চলেছে। অনেক অবান্তর কথাও হচ্ছে এবং অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাও।

কিন্তু একটা বিষয় আজও তারা বুঝে উঠতে পারছে না। ওদের মনে এর জন্যে একটা বিস্ময় লেগেই আছে। অতি সাধারণ আর সামান্য মেয়ে যে দিবা—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যই বলতে হবে—অভিনয়ের সময়ে যেভাবে ও যে ভঙ্গিতে সে সংলাপগুলো উচ্চারণ করে তাতে মনে হয়, ও যেন অবিকল নিজের কথা বলছে। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলে ও। এবং তার ফলে চরিত্রটা একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। অচিনপুরীর অধিবাসিনী একাকিনী ফুল্লরা এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে যে—

মিহি সুরে একটু বুঝি আপত্তি করে উঠল স্নেহাংশু, বলল, 'নাট্যকারের বুঝি কোনো কৃতিত্ব নয়? সব কেরামতি বুঝি ঐ নটীর?'

আবার জিভ কাটল নীহার, বলল, 'ছি। জিভ সামলে কথা বলো। উনি নারী—'

স্নেহাংশু একটু হাসল, হেসে বলল, 'গ্রামারে ভুল হল নাকি? কি জানি! কিন্তু নটী কি নারী না? সব নারী নটী হতে না পারে, কিন্তু সব নটীই যে নারী—এ সংবাদটা একটু জেনে রেখো হে ফায়ার ব্রিগেড।'

'হ্যাঁ।' হরেশ বলল, 'দমকলে একটু দম দিয়ে দেওয়াই দরকার হয়েছে। অনবরত জিভ কাটছে। ওর ঐ বেহায়াপনা দেখে মাথা কাটা যাচ্ছে আমাদের। আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে—ওকে নিয়ে গিয়ে সমর্পণ করে দিয়ে আসি ওর হাতে, সেখানে গিয়ে ও হয়ে যাক নট।'

'কি কি কি?' একটু বুঝি ঝুঁকে বসল নীহার, জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল কথাটা? ওর কাছে গিয়ে নট্ হয়ে যাব? অর্থাৎ আমাকে হুটাউট করে দেবে ও? ওই দিবা? হায় হায় হায়, কিবা কব এর উত্তরে আর। সাধ্য আছে ঐ মেয়ের, কিংবা তার কি তেমন সাধ আছে? কোনো পুরুষকে

হেলায় হারাতে পারে না ওরা। ওসব মেয়ের কাছে সব পুরুষই বরণীয়। তুমি আমি এবং আমাদের মধ্যের আরও অনেকে লোভে লোভার্ত হয়ে ওকে হয়তো বলব বরনারী, কিন্তু বাইরে ওদের পরিচয় আলাদা, সেখানে ওরা বারনারী।'

স্নেহাংশু বলল, 'কথাগুলো তো বলছ বেশ বিজ্ঞের মত। কিন্তু এত জ্ঞান এতক্ষণ ছিল কোথায়? এতক্ষণ যে খুব জিভ কাটছিলে, আর নারী-নারী করে হৈ-হৈ করছিলে?'

'এখনো নারী-নারী বলব', নীহার বলল, 'বরনারী বারনারী।'

অমিয় এতক্ষণে বলল, 'বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? একটা মেয়েকে নিয়ে এতটা হৈ-চৈ ভালো না। আর, তা ছাড়া, এখন সে আমাদের এই নাট্যসংঘের একজন। তার জীবিকা যাই হোক, কিন্তু জীবিকাটাই তার পরিচয় নয়। হরেশ তো কাজ করো টাকশালে, দীপক আছ পোর্টে, বীরেন করো অধ্যাপনা, নীহার দমকলে, আর ওরা তিনজন ব্যাঙ্কে—এবার আমরা যদি ঐ সব জীবিকা দিয়ে তোমাদের পরিচয় ঠিক করে ফেলি তবে কি সেটা ঠিক হবে? সুতরাং ও কথা থাক্। ওই যে, উনি এসে গেছেন।'

দরজার দিকে তাকাল সকলে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে লম্বা স্ট্রাপে দোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতে একটা ছাতি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাঁ হাতের কব্জিটা একটু উল্টে নিয়ে হাতঘড়িটা দেখে বারান্দায় পৌঁছে গেল দিবা।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না।'

দিবা বসল, শাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। কাঁধের উপরে শাড়ির আঁচলটা টেনে নিয়ে বলল, 'নতুন নাটক কতদূর?'

স্নেহাংশু বলল, 'আপনি কতদূর থেকে এলেন বলুন।'

'আঁদুল।' দিবা বলল, 'সেদিন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ ওখানে রিহার্সেল ছিল। সবটা রিহার্সেল দিলাম না আজ, তাড়াতাড়ি চলে এলাম, আপনারা অপেক্ষা করছেন মনে পড়া মাত্র—'

বাধা দিয়ে কথা বলে উঠল নীহার, বলল, 'আমাদের উপর তাহলে খুব টান হয়েছে বলতে হবে।'

দিবা হাসল, বলল, 'বহুবচনে বলছেন কেন, একবচনেই বলুন না!'

চমকে গেল যেন নীহার, বলল, 'কি বললেন?'

'ঠিকই বলেছি। কিছু ভুল হয় নি।' বলে হাসতে লাগল দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিবার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে পারল না কেবল নীহার। তার সব তাপ, সব তেজ হঠাৎ কেমন ঠান্ডা হয়ে গেল। তার মুখের ভাব যেন বদলে গেল কেমন। নিমেষের মধ্যে বেকুব-বেকুব চেহারা হয়ে গেল নীহারের, আর কোনো কথা সে বলতেই পারল না, তার দম যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে।

আশা আনন্দ দ্বন্দ্ব—এই ত্র্যহস্পর্শে নীহারের সর্বাঙ্গে বুঝি শিহরণ দেখা দিল। এতগুলো মানুষের মেলার মধ্যে হঠাৎ সে যেন হয়ে গেল একা ও একক। দিবার কথার আর উত্তর দিতে পারল না সে।

নীহারের মুখের দিকে তাকাতে লাগল সকলেই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দীপক শব্দ করে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল সে, তার পর আক্ষেপের সুরে বলল, 'হতভাগ্য আমরা। আমরা এত তোয়াজ করে চললাম, তোষামোদও বুঝি করেছি কত—কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে কি আর হবে?'

দিবা হাসল, বলল, 'আক্ষেপের কি আছে? একবার ঐ কথা বললেই যদি ভাগ্য ফিরে যায় তাহলে ফিরিয়ে নিন আপনার ভাগ্য।'

'কি কথা, কি কথা?' হরেশ আর স্নেহাংশু প্রশ্ন করল একসঙ্গে।

দিবা আর কিছু বলল না।

ঘরটা কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। হঠাৎ এই স্তব্ধতা বড় অস্বাভাবিক মনে হল। কি কথা দিয়ে কথা আরম্ভ করা যায়—সকলেই হয়তো খুঁজছে সেই কথাটা।

কিন্তু কথা বলল দিবা। বলল, 'জানেন, সবই কেমন অদ্ভুত লাগে। জীবনটা বড় মজার মনে হয়। আমরা কত সামান্য মেয়ে, আমরা কত সাধারণ। আমাদের নামে কত দুর্নাম। আমরা অভিনয় করি, অভিনয় আমাদের পেশা। কত মানুষের সঙ্গে কতভাবে মিশি আমরা, মিশতে আমাদের হয়। না মিশে উপায় আমাদের নেই—মেশাটাই আমাদের ব্যবসা। এই ব্যবসায় নেমেছি আমরা, আমরা তাই কত সস্তা। অথচ, আমাদের মত মেয়ের মুখ থেকে একটুমাত্র অন্তরঙ্গ কথা শুনলেই মানুষে কি রকম যেন হয়ে যায়। এসব যখন দেখি, তখন নিজেকেই কেমন বেকুব মনে হয়; জীবনটা বড় অদ্ভুত লাগে, বড় মজার লাগে সব ব্যাপারটাই। কেন এমন হয় বলুন তো?'

দিবার কথা শুনে সকলেই বুঝি বেকুব হয়ে গেল। কারও মুখেই কোনো কথা ফুটল না। কিন্তু হরেশ বলে উঠল, 'ওসব ব্যাপার বড় জটিল। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারটাই বড় গোলমেলে। আপনি ওসব প্রশ্ন ক'রে আর

গোলমাল বাধাবেন না। আসুন, কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক।'

কাজের কথা অবশ্য কিছুই নেই তাদের। তারা যে এখানে এসে মিলিত হয়েছে এইটেই যেন মস্তবড় একটা কাজ।

কিন্তু কাজের কথা আছে বৈকি। অনেক কথা আছে কাজের। দিবা বলতে চায় সেই কাজের কথা।

স্নেহাংশুর দিকে চেয়ে দিবা বলল, 'কবে যাবেন বলুন? চলুন, আর কেউ না। আমি আর আপনি। দুজনে চলে যাই।'

তৈরি ছিল না স্নেহাংশু, হঠাৎ এই প্রস্তাবে ভীষণ বিব্রত ও বিচলিত হয়ে উঠল সে। অমিয়র মুখের দিকে একবার তাকাল, একবার তাকাল মনোজের মুখের দিকে। কিন্তু তাদের দিক থেকে সহানুভূতির বা সহায়তার কোনো লক্ষণ না দেখে সে তাকাল দিবারই দিকে, বলল, 'কোথায়?'

'যেখানে দুচোখ যায়।'

দিবার আজ হল কি? সহজ আর স্বাভাবিকভাবেই সে কথা বলে বটে, কিন্তু আজ যেন তার কথার মধ্যে একটু রঙ্গ ও একটু রসিকতা জমে জমে উঠছে?

নীহার স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বুঝি একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই। হঠাৎ স্নেহাংশু যদি রাজী হয়ে যায় এবং দুজনে যদি সত্যি-সত্যিই এখান থেকে রওনা দেয়, তাহলে সে ঘটনাটা তার বুকে ভীষণ বাজবে।

নীহার কি-যেন বলতে গিয়ে ঢোক গিলে ফেলল।

অমিয়ই জিজ্ঞাসা করল, 'চোখ-দুটো যেতে চাচ্ছে কোথায়?'

দিবা বলল, 'সেদিন যে বললাম। আমি দেখতে চাই ঐ নায়িকাকে। আমাদের নাটকের নায়িকাকে।'

'ওঃ, এই কথা!' নীহার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্নেহাংশুর বুঝি ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

স্নেহাংশু বলল, 'ঠিক। যেতে হবে একদিন। সঙ্গে আপনাকে পেলে তো সুবিধেই। মহিলা সঙ্গে থাকলে মহিলামহলে ঢুকে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। দূর থেকে যাকে দেখেছি, তাকে দেখা হয়ে যাবে কাছ থেকে।'

'বটেই তো!" অমিয় বলল, 'এটা উভয়েরই ভাগ্য। স্নেহাংশু দেখবে তার নায়িকাকে, নায়িকা দেখবে তার নাট্যকারকে। আর আমরা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শঙ্খধ্বনি করব, আমাদের সঙ্গে যে মহিলা থাকবেন তিনি যদি রাজী হন তবে তিনি একটু হুলুধ্বনি করবেন।'

'একটা ভীষণ হুলুস্থূল ব্যাপার হবে।' বলে উঠল বীরেন।

স্নেহাংশুর মুখ লাল হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তার মুখ যেন কালো হয়ে গেল।

মুখ কালো তার হল বটে, কিন্তু দিবার প্রস্তাব-মত একটা অভিযানে বের হতে ইচ্ছেও তার হতে লাগল বেশ। একটা মেয়েকে একদিন দেখে ফেলে একটা নাটকই লিখে ফেলল সে। আবার একটা অভিযানে গিয়ে আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে কারো সঙ্গে, আবার হয়তো পেয়ে যাবে নতুন কোনো উপকরণ, আবার লিখে ফেলবে নতুন একট নাটক।

অভিনয় করার জন্যে নায়িকা তো আছে তাদের জিম্মায়। তাদের অসুবিধে আর আছে কি? এখন চাই নতুন একটা নাটক।

দিবার কথা হচ্ছে এই যে, নায়িকার চরিত্রটি যেভাবে এঁকেছে স্নেহাংশু, তাতে ঐ নায়িকার উপর আকর্ষণ কারো না হয়ে পারে না। নির্জন একটি বাড়িতে একা বাস করছে একটি মেয়ে বিচিত্র একটা জীবন নিয়ে।—এ কথা ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে। এবং যেভাবে সে জীবন কাটাচ্ছে, সে তো আরও বিচিত্র। মেয়েদের চিনতে নাকি দেবতারাও পারেন না; অথচ মানুষে প্রত্যহ তাদের চিনবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে। এটা মানুষের ধৈর্যেরই পরিচয়। এই অধ্যবসায় মানুষের আছে বলেই মেয়েরা তাদের কাছে আজও রহস্য। সেই রহস্যভেদ করার জন্যেই অনবরত লেখা হচ্ছে নাটক, অনর্গল লেখা হচ্ছে উপন্যাস, এবং আরও কত-কি হয়ে চলেছে তার বিবরণ দিয়ে লাভ কি।

এইসব কথা নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা হল ওদের মধ্যে। তা তো হল। কিন্তু দিবা নিজেই যে একটি রহস্য হয়ে আজও তাদের কাছে রয়ে গিয়েছে, এ কথাটা তাকে বলা হল না।

সভার শেষে সকলে উঠে পড়ল। দিবাও উঠে পড়ল। গলিটা পার হয়ে তারা এসে পেঁছিল সদর সড়কে—ডায়মণ্ডহারবার রোডে।

দিবা কোথায় থাকে, তার সঙ্গে আর-কেউ থাকে কি না—এ খবর জানার কৌতূহল তাদের আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে খবর কেউ পেল না।

মনোজদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে তার যোগ অনেক দিনের। তবু তারাও কেউ কিছু জানে না। হয়তো জানার তেমন-কোনো চেষ্টা কেউ কখনো করে নি বলেই আজও জানতে পারে নি। উঠে-পড়ে লাগলে কি এই সামান্য ব্যাপারটা আর জানা যায় না?

মোমিনপুরের মোড় থেকে দিবা একটা বাস-এ উঠে পড়ল। হঠাৎ ও যে এভাবে রওনা দেবে তা কেউ ধরতে পারে নি। তারা প্রস্তুতও ছিল না। হঠাৎ তাদের দলকে কানা করে দিয়ে ঐ চলে গেল দিবা।

দিবা চলে গেল। ডায়মণ্ডহারবার রোডেই কেবল না, তাদের প্রত্যেকের মনে হঠাৎ যেন নেমে এল নিশা। অন্ধকার রাস্তার দুধারে আলো জ্বলে উঠেছে; ঐ আলোকিত অন্ধকার ভেদ করে একবালপুরের দিকে ঐ চলে যাচ্ছে দিবার বাস্।

'মেয়েটা মারভেলাস।' মন্তব্য করল নীহার।

'শুধু মারভেলাস নয়, এক্সেলেণ্ট—গ্র্যাণ্ড।' বলল হরেশ, 'আজ ওর মেজাজটাও ছিল অদ্ভুত রোমাণ্টিক।'

'ওসব—বুঝলে হে বেকুব', দীপক মিত্র বিজ্ঞের মত বলল, 'ওসব হচ্ছে অভিনয়। রোজ রাত্রে ওরকম অনেক অভিনয় ওকে করতে হয়। ওর কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না। চলো, ঘরের ছেলে ঘরে চলো। ওসব মায়া, সব মরীচিকা।'

কথাটা শেষ করেই অট্টহাস্য করে উঠল দীপক। তারপর থেমে বলল, 'কিন্তু এটা ঠিক। আজ ও বড় কাবু করে দিয়ে গিয়েছে আমাদের। একেবারে ঘায়েল করে দিয়ে গেছে। অদ্ভুত সুন্দরভাবে কথা বলেছে আজ।'

'রাত্রের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্যে এটা নিশ্চয় ওর রিহার্সেল।' মন্তব্য করল স্নেহাংশু।

মনোজ রেবতী আর বিকাশ কিছু বলল না। দিবার সঙ্গে পরিচয় তাদের আগের। তাই তারা দিবাকে ওদের চেয়ে একটু বেশি আপনজন বলে মনে করে বলেই হয়তো চুপ করে গেল।

কিন্তু চুপ করে গেলেই সব ব্যাপার চাপা পড়ে যায় না। দিবার কথাও চাপা পড়ে গেল না।

হঠাৎ সে কিছু না বলে পালিয়ে গেল। আবার কবে আসছে তার কিছু আভাসও দিয়ে গেল না। আবার হয়তো চলে যাবে আঁদুলে, হয়তো চলে যাবে শ্রীরামপুরে, চন্দননগরে, রিষড়ায়, কিংবা কোনো জাগ্রামে। তবে তার সেই অভিযানের দিনটি স্থির করা যাবে কেমন করে? কেমন করে যাওয়া যাবে তবে সেই অচিনপুরীর অচিনকন্যাটির সন্ধানে।

কন্যা মানেই অবশ্য অচিন। তাদের চেনা বড় কষ্ট। দূর থেকে দেখে চেনা তো যায়ই না, এত কাছ থেকে দেখেও যে চেনা যাচ্ছে না।

ওদের দলের মধ্যে সকলেই কাজ করে বিভিন্ন দপ্তরে। তারা বন্দী থাকে তাই ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। কিন্তু ওদের মধ্যে মুক্তপুরুষ যে, তার নাম নীহার—নীহার বসু।

নীহারের কাজ আগুন নেভানো। বিপদের সংকেত পাওয়া মাত্র পাগলা ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা দৌড় দেয়। রাস্তার যানবাহন

থেমে গিয়ে তাদের পথ করে দেয়। মুক্ত আকাশের নিচ দিয়ে গিয়ে সে উপস্থিত হয় আগুনের সামনে। অনেক আগুন ও অনেক বিপর্যয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে অনেকবার।

কিন্তু একটা আগুন বিপর্যয় এনেছে যেন তার জীবনে। সেই আগুনের কথা ভাবতে-ভাবতেই নিজেকে বিপন্ন করে তুলতে লাগল সে। কত শিশুকে আর কত নারীকে সে উদ্ধার করেছে আগুনের ভীষণ গ্রাস থেকে, কিন্তু নিজেকে উদ্ধার করতে যেন সে পারছে না ঐ একটা আগুন থেকে।

সেদিন তখন বিকেল হয়েছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের তাদের স্টেশন থেকে তাদের গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে পড়েছে এণ্টালি থেকে একটা সংকেত পেয়ে। মাথায় তার লোহার টুপি। কি রকম আগুনের সঙ্গে তার দেখা হবে, দলের আরও দশজনের সঙ্গে সেই কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছে সে। পিতলের ঘণ্টার চাকচিক্য যত, আওয়াজ তার থেকেও জমকালো। সেই ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে চলেছে তারা।

শিয়ালদহের ভিড় ডিঙিয়ে যখন তারা চলেছে, তখন হঠাৎ—হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঐ আগুন। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল তার। সে স্পষ্ট দেখল, ফুটপাথ ধরে চলেছে দিবা। সাজের ঘটাটা বেশ মনে হল। নীহার তাকাল তার দিকে। নীহার স্পষ্ট দেখতে পেল তাকে। দিবাও ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল একটু। গাড়িটার দিকেও তাকাল, নীহারের দিকেও বুঝি তাকাল। কিন্তু নীহারকে কি সে চিনতে পেরেছে? নীহারের সাজও তখন আলাদা—সেটাকেও সাজের ঘটা হয়তো বলা চলে।

অ[illegible]দিন থেকে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এবং যার কথা সে ভাবছে, তাকে [illegible] কাছ থেকে দেখেও ঠিক দেখা হল না।

[illegible] গাড়িটা উধাও হয়ে চলে গেল।

[illegible] কিন্তু দেখতে পেয়েছে নীহারকে। দমকলের ঘণ্টা শুনলেই দি[illegible] বুকটা কেঁপে ওঠে। বুক কেঁপে যায় বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা [illegible] কাঁপে না। স্পষ্টই দেখেছে সে নীহারকে, লোহার টুপির নিচে [illegible]কলেও সে চিনতে পেরেছে ঐ মুখ।

একেই বলে অদৃষ্ট, আর একেই বলে বরাত। যাকে এড়িয়ে চলার জন্যে তার এত চেষ্টা, তার সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল তার।

যাক গে। অমন দেখা হয়ে যাওয়ায় ক্ষতি নেই। দেখা তো ওর সঙ্গে হয়ই সেই মোমিনপুরে, আজ না হয় হল শহরের অন্য প্রান্তে, এই শিয়ালদহে। দেখা হোক, বেশি মাখামাখি না হলেই হল।

কিন্তু নীহারের মনোভাবটা আবার বিপরীত। সে চায় একটু মাখা-

মাখিই বুঝি করতে। তাই তার আগ্রহটা একটু যেন উগ্র হয়েই উঠেছে। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী সে, আগুন নিয়ে খেলাই তার কাজ। আগুনকে তাই তার আর ভয় নেই।

দিবাকে সে কি মনে করে, সে কথা অনেক আগেই সে তার বন্ধুদের কাছে অকপটে খুলে বলেছে। বিশেষ ক'রে বলেছে সেইদিন রাত্রে—যেদিন হরেশ আর মনোজ দিবাকে পেঁৗছে দেবার জন্যে রওনা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অতটা উত্তাপ সে সেদিন দেখাল কেন, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। হয়তো তার মধ্যে বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিল, সেই দুর্বলতা চাপা দেবার জন্যেই সে প্রবল প্রতাপে মেয়েটার প্রতি তার ঘৃণা জানিয়ে ফেলেছিল।

নাম ওর দিবা, অথচ, নীহারের মনে হয়, ওর নাম হওয়া উচিত ছিল দীপশিখা। আগুনই বটে ও, কিন্তু বড় নরম আগুন। ঐ আগুনের দিকে তাকালে চোখ ঝলসায় না, চোখে বেশ ঠাণ্ডা একটু আঁচ লাগে।

শিয়ালদহের মোড়ে তাকে ঐ এক বিকেলে দেখে নীহারের বড় ইচ্ছে হয়েছে ওর সঙ্গে একা দেখা করার। এবং দেখা করে ওর ডেরা চিনে আসার। পাঁচজন মানুষের মেলার মধ্যে তাকে নিয়ে রঙ্গতামাশা হয়তো একটু করা যায়, কিন্তু মন মাতিয়ে মজা করা যায় না। মেয়েটাও তো বেশ ঝানু, ঠিক কার উপর টান তার বেশি, তা ওর আচার-আচরণে ধরা বড় কঠিন। একদিন ওকে একা পাকড়াও করে ওর মনের খবর জানতেই হবে।

এই ইচ্ছেটা মনের মধ্যে পুঁজি ক'রে দিন-কয়েক নীহার অধীর আগ্রহে দিন কাটাল। তার ডিউটি বদল হলে, বিকেলের দিকে সে ফ্রী হলে, সে ধরার চেষ্টা করবে ওকে। কাউকে সে বলল না তার মতলবের কথা এবং, আশ্চর্য, কারও কাছে একবারও সে নাম উচ্চারণ করে না দিবার। উচ্চারণ আর করবে কেন, সে তো এখন পুরোপুরি দিবাস্বপ্নে বিভোর।

অনেক স্বপ্নের কথা সে ভাবছে, এবং অনেক সম্ভাবনার কথাও ভাবছে সে। আলাপ-পরিচয় করে ঘনিষ্ঠতা হবার পর কাউকে না জানিয়ে দিবাকে নিয়ে সে চলে যাবে শখের সফরে। পুরীর সমুদ্রতীরে যাবে, যাবে চলে কোনারকের সূর্যমন্দিরে। ওসব জায়গার অনেক গল্প শুনেছে নীহার, কিন্তু যাওয়া কখনো হয় নি। ওসব জায়গায় যেতে হলে এমনি মনের মত সঙ্গী পাওয়া যে দরকার, তা অবশ্য সে বুঝতে পেরেছে। অভিনয়ের সময়ে যে মেয়ে অত সুন্দর ক'রে সহজ ক'রে কথাগুলো উচ্চারণ করতে পারে, আন্তরিকভাবে কথা বলার সময়ে তার সেই কথাগুলি কতটা অন্তরঙ্গ ও কতটা রোমাঞ্চকর হয়ে যে উঠবে, তা বেশ আন্দাজ করতে

পারছে নীহার বসু। যতই সে তা আন্দাজ করতে পারে ততই তার কান দুটো গরম হয়ে ওঠে, ততই তার দুহাতের পাতা ঘামে ভিজে যায়।

কয়েকটা দিন বড় উত্তেজনায় ও উগ্র ভাবনায় নীহারের দিন কাটল। অবশেষে তার বদল হল ডিউটি। বিকেলটা হল তার ফ্রী।

শিয়ালদহের মোড়ে এসে দাঁড়াল নীহার বসু। বাস্‌স্টপে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যে, একটা বাস-এ জায়গা পেলেই সে উঠে পড়ে। কিন্তু বাস্‌গুলো সবই খুব ভর্তি হয়ে আসছে। উঠতে না পেরে খুব বিরক্ত হয়েই যেন সে একটু পায়চারি করে নিল। সেই সময়ে সে দেখে নিতে লাগল রাস্তার সব মানুষকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো বাস্‌-এ উঠতে না পেরে সে এসে দাঁড়ায় পানের দোকানে।

পানের দোকানে এসেই বলল, 'ইশ, একটা বাস্‌-এ ওঠার উপায় নেই। দেখি, একটা পান দাও।'

পান সাজতে-সাজতে পানওলা বলল, 'যাবেন কোথায়?'

প্রস্তুত ছিল না নীহার, বলে ফেলল, 'বেহালায়'।

'বেহালায় যাবেন তো' পান দিতে-দিতে পানওলা বলল, 'তবে এদিকে দাঁড়াচ্ছেন কেন, রাস্তার ওপারে যেতে হবে যে!'

চমকে গেল নীহার, একটু অপ্রস্তুতই বুঝি হল, বলল, 'ওঃ, তাই বুঝি, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো হবে।' ব'লে পান নিতে যাবে অমনি আয়নায় কার যেন ছায়া পড়ল?

ফিরে তাকাল নীহার, বুক দুরদুর করে উঠল তার। পানটা কোনো রকমে নিয়েই সে হাঁটা দিল। রাস্তা পার হবার মত ক'রে এগিয়ে গিয়ে ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার কিনার ধ'রে দ্রুত হেঁটে চলল নীহার বসু।

কিছুক্ষণ রাস্তা-বরাবর হেঁটে গিয়ে নীহার উঠে পড়ল ফুটপাথে। একটু পা চালিয়ে চলল নীহার। মেয়েটা তো বেশ তর্‌তর্‌ ক'রে হাঁটে।

এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে নীহার বলল, 'এই যে!'

শব্দটা হয়তো শুনল দিবা, রাস্তায় অমন অনেক শব্দই শুনতে হয় হামেশা। কিন্তু সব শব্দ শুনতে হয় না, শুনতে নেই—এই নিয়মটা মেনেই তাদের পথচলা। তাই প্রথমটা ও সাড়াও দিল না, ফিরেও তাকাল না।

কিন্তু নীহার এখন সাহসে যেন দুর্জয়, আগুন নিয়ে খেলা করায় তার বুঝি অনন্ত উৎসাহ। তাই সে আবার বলল, 'এই যে দিবা দেবী।'

নিজের নাম শুনে ফিরে তাকাতেই 'ও হরি, আপনি? এদিকে কোথায় চললেন?'

নীহার হেসে অকপটে বলল, 'আপনারই অন্বেষণে।'

সারপেণ্টাইন লেনের মোড়ে তারা তখন উপস্থিত হয়েছে, দিবা থেমে গেল, বলল, 'তাই বুঝি? পুরুষমানুষরা কত রকম কথাই জানে তার ঠিক নেই। নিশ্চয় কোনো জরুরী কাজে যাওয়া হচ্ছে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, আর অমনি সব বাজে কথা। যাক গে, এদি'কে চললেন কোথায়?'

মনে অনেক শক্তি জোগাড় করে নিয়ে নীহার একবার একটা কথা বলে ফেলেছে; বলে ফেলেছে যে, সে তারই অন্বেষণে এসেছে। কিন্তু দিবার অত কথা শুনে এবং ঐ প্রশ্ন শুনে সে বলে ফেলল, 'একটা কাজেই অবশ্য এদিকে এসেছিলাম। কিন্তু দেখা যখন হয়ে গেল, তখন থাক গে ওসব কাজ।'

'বেশ স্বার্থপরের মত বললেন তো কথাটা।' দিবা সামান্য একটু হেসে বলল, 'নিজের দিকটাই দেখলেন, অন্য দিকটার কথাও তো ভাবতে হবে!'

'যথা?'

'থাক গে কাজ ব'লে কাজের কাছ থেকে ছুটি হয়তো আপনি পেয়ে গেলেন, কিন্তু আর একজনের হয়তো অত সহজে ছুটি মিলবে না।'

নীহার দমল না, বলল, 'ও সব বাজে কথা, তর্কের কথা। এমন কি কাজ আপনার থাকতে পারে এখন? সারাদিন তো কাজ হল, এখন চাই বিশ্রাম।'

সামান্য একটু ম্লান হাসি হাসল দিবা, প্রতিধ্বনি করার মত করে উচ্চারণ করল, 'বিশ্রাম! তাই বটে। সারাটা দিন আমার মহড়া, কাজ আমার এখনই।'

নীহারের বুকের ভিতরটা একটু ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। এখন, এই সন্ধ্যায় কাজ শুরু? তবে এ'কে যেমনটি সে আন্দাজ করেছে এ তবে তেমনটিই। হোক গে, তাই না হয় হল! তাতে বা তার ক্ষতি কি? নীহার চায় একজন সঙ্গী, সে তো আর বধূ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে নি আজ রাস্তায়।

নীহার যেন কিছু বুঝতে পারে নি, এইভাবে বলল, 'সারাদিন বুঝি রিহার্সেল চলল? কোথায় অভিনয় আজ? আঁদুলে, না মৌড়িগ্রামে, না, দমদমে? কোথায়?'

'তা, নাই জানলেন?'

'খুব গোপনীয় বুঝি?'

'খুব গোপনীয়। নেহাতই ব্যক্তিগত।'

কিন্তু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলাটা বুঝি শোভন হচ্ছে

না। আশপাশ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা একবার করে এদের দিকে চেয়ে-চেয়ে যাচ্ছে, ট্রাম-বাস-এ যারা যাচ্ছে তারাও এক-চোখ তাকিয়ে নিচ্ছে এদের দিকে।

ব্যাপারটা যদি সহজ আর স্বাভাবিক হত তাহলে হয়তো বিশেষ কিছু ভাববার ছিল না, কিন্তু ঘটনাটা যখন কিছুতেই স্বাভাবিক নয়, সুতরাং তারা একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগল।

বেশি অস্বস্তি অবশ্য বোধ করছিল দিবা। সে ভাবছে, নীহার যদি তার সঙ্গ না ছাড়ে তাহলেই মুশকিল।

নীহারের অস্বস্তিও সামান্য না। সে ভাবছে, দিবা যদি তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তার সব প্ল্যান মাটি, সব দিবাস্বপ্ন ভেঙে চুরমার।

ওরা ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল মৌলালির দিকে। কোনো তাড়া বা তাগাদা আদৌ বুঝি নেই। খাটো গলায় গল্প করতে-করতে ওরা খাটো-খাটো পা ফেলে হেঁটে চলল।

দিবাকে আজ নতুন লাগছে, নতুন স্বাদ লাগছে তার সঙ্গটার, নতুন উত্তাপ লাগছে তার শরীর থেকে। অন্যান্য দিন একে পেয়েছে অনেক মানুষের মধ্যে, গা ঘেঁষেও নিশ্চয় বসেছে, কিন্তু এমন স্তিমিত তাপ বুঝি পায় নি তার শরীর থেকে। হাঁটতে-হাঁটতে গায়ে এক-একবার একটু ছোঁয়া লাগছে, অমনি এক-একটা বৈদ্যুতিক শক অনুভব করছে নীহার।

নীহার একটু নিস্তেজ হয়ে এসেছে, যতটা সমাদর পাবে ব'লে সে মনে করেছিল, ঠিক ততটা না পেয়ে নিজের কাছেই সে হয়তো একটু হেরেছে। তাই একটু সাবধানেই সে প্রস্তাব করল, 'খুব তাড়া যদি না থাকে তাহলে এক জায়গায় একটু বসা যাক।'

'কোথায় বসবেন? এখানে বসলে তো পথে বসা হবে।' বলে দিবা একটু হাসল। 'পথেই বসতে চান নাকি?'

'আপনি যদি চান, তবে তাতেও আপত্তি করব না। আসলে, একটু বসতে চাই।'

সামনেই একটা ছোট রেস্তোরাঁ, নাম তার শ্যামলী, ওরা গিয়ে ঢুকল সেখানে। এক কোণে ছোট একটি টেবিলের সামনে বসল দুজন। মুখোমুখি বসল তারা।

নীহার, বলল, 'অদ্ভুত চমৎকার লাগছে। কখনো এভাবে দেখা হয়ে যাবে, আর এভাবে আমরা বসব কখনো ভাবি নি।'

দিবা ও-কথার মধ্যে গেল না, বলল, 'কি খাবেন বলুন। নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে?'

নীহার এক চোখ সামান্য একটু ছোট ক'রে একটু চাপা গলায় বলল,

'ক্ষিদে ঠিক না, যা পেয়েছে তাকে বলতে হয় পিপাসা।'

নীহারের এ-কথার ইঙ্গিত বোঝা খুব কঠিন না। দিবা খুব সহজেই তা বুঝতে পারল, কিন্তু না-বোঝার ভাণ করে বলল, 'তবে চা বলি।' বলেই দিবা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু?'

'থাক্', নীহার আবার হাসল এক চোখ ঈষৎ ছোট ক'রে বলল, 'অন্য কিছুর আর দরকার কি? সঙ্গে তো আপনিই আছেন।'

খুব লাগ-সই একটা কথা এতক্ষণে বলতে পেরেছে ব'লে নীহার বেশ তৃপ্তি বোধ করল, এবং ঐ তৃপ্তির আমেজেই বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, 'এই এই। দু-কাপ চা নিয়ে এস, আর দুটো টোস্ট।'

নীহার একটু গদ-গদ গলায় বলল, 'আপনাকে দিবা না বলে আমার বলতে ইচ্ছে করে দীপশিখা।'

'তাই বুঝি? আমারও আপনাকে বলতে ইচ্ছে করে নীহারিকা।'

'কেন? নীহারিকা কেন?'

দিবাও জিজ্ঞাসা করল, 'দীপশিখাই বা কেন?'

'দীপশিখা হচ্ছে ঠাণ্ডা, কোমল, যাকে বলে স্নিগ্ধ; অথচ তাতে আলো আছে, তেজ আছে। আপনার মধ্যেও আছে এগুলি, সুতরাং।'

দিবা কথাগুলো ভালো করে শুনে নিল, তার পর বলল, 'আপনিও ঠাণ্ডা, আপনিও কোমল, আর আপনি কত দূরের। পড়েন নি রবিঠাকুর?—ঐ যে সুদূর নীহারিকা? আপনাকে দেখেই আমার মনে পড়ে ঐ কবিতাটির কথা। আপনার কথাগুলোও বেশ মেয়েলি, তাই ঐ মেয়ে-নামটা—'

বেশ উৎসাহ নিয়ে শুনছিল নীহার, কিন্তু হঠাৎ সে কেমন বেকুব ও বিব্রত হয়ে উঠল, বাধা দিয়ে বলল, 'থাক। দীপশিখার সঙ্গে মিলিয়ে নামটা যে রাখলেন, এজন্যে ধন্যবাদ।'

চায়ে চুমুক দিয়ে দিবা বলল, 'মেয়েলি নাম আপনাকে দিলাম বটে, কিন্তু আপনি যে কাজ করেন সে কাজ কিন্তু পাকা পুরুষালি কাজ। আগুন নেভানো আপনাদের কাজ। এ কাজের উপর আমার খুব শ্রদ্ধা। কোথায় আগুন লাগল, খবর পাওয়া মাত্র ছুটে যান আপনারা। অনেক সময় নিজেদের জীবনও হয়তো তুচ্ছ করেন। কত বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করেন। তাই না? কয়েকদিন আগে আপনাদের লালগাড়িতে লোহার টুপি মাথায় দিয়ে আপনাকে যেতে দেখে খুব ভালো লেগেছিল।'

নীহার বলল, 'অনেক খবর রাখেন তো আপনি। কিন্তু সেদিন ঐ পোশাকে আমাকে ভালো লেগেছিল। আর আজ? এখন, এখানেই এখন নিশ্চয় অতটা ভালো লাগছে না?'

'ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে?'

'নির্ভয়েই বলবেন।'

'আজ তেমন ভালো লাগছে না।'

চুমুক দিতে গিয়েই থেমে গেল নীহার, বলল, 'তবে এলেন কেন এখানে? ভালোই যদি না লাগছে?'

সংক্ষেপে উত্তর দিল দিবা, বলল, 'অনুরোধে।'

'অনুরোধের এতটা দাম আপনি দেন?'

'দিই। দিতে হয়। সামান্য ওটুকু ভদ্রতা করলে কোনো ক্ষতি নেই মনে করি বলেই দাম দিই অতটা। যদি রাস্তা থেকেই বিদায় দিতাম আপনাকে কিংবা নিজেই বিদায় নিতাম আপনার কাছ থেকে—তবে সেটা নিশ্চয়—'

কথা কেড়ে নিল নীহার, বলল, 'নিশ্চয়। নিশ্চয় সেটা মর্মান্তিক হত। কিন্তু আজ আমাকে তেমন ভালো লাগছে না জেনেও আপনার কথা শুনে বেশ উৎসাহ পাচ্ছি—অনুরোধ আপনি রাখেন, অনুরোধ রাখতে আপনি রাজী আছেন? সুতরাং আপনাকে আজ অনুরোধ জানাতে আমি আর সংকোচ করব না।'

দিবা বুঝতে পারল নীহারের অভিপ্রায়। মনে মনে সে শক্ত হয়ে বসল, একটু সতর্কও বুঝি হয়ে নিল, বলল, 'আপনার কাজ আগুন নিয়ে। সেদিন আপনাদের ট্রাকে যখন আপনাকে দেখি, তখন আপনাকে ভালো লাগল, এক লহমার তো মাত্র দেখা, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই আপনাকে বেশ বলিষ্ঠ, বেশ শক্ত, বেশ তাজা একজন পুরুষের মত দেখাল। আন্দাজ করতে পারলাম আপনি চলেছেন এক অজানা বিপদের উদ্দেশে, সেখানে গিয়ে কি অবস্থায় পড়বেন, কিছু না জেনে। বিপদটা ভয়ংকর হলেও নিস্তার নেই, সে বিপদ মাথা পেতে নিয়ে—'

'এত জানলেন কি ক'রে?'

'জানি জানি। সে বিপদ মাথা পেতে নেবার জন্যে তৈরি হয়েই চলেছিলেন। আপনার ঐ যাওয়া দেখে ভয়ংকর আনন্দ পেয়েছিলাম। কল্পনা করছিলাম, আগুনের ফাঁদে যারা পড়ে গিয়েছে, তাদের উদ্ধারও নিশ্চয় করবেন।'

'এগজ্যাক্টলি। সেদিন সত্যি বাঁচিয়েছি তিন জনকে—দুটো বাচ্ছা সমেত একটি—'

'থাক।' বাধা দিল দিবা, 'ঐ তো আপনাদের কাজ। ঐ তো পুরুষের কাজ। আপনারা তাই নমস্য, আপনাদের শ্রদ্ধাই করি।'

একটু দম নিয়ে নিল দিবা, টেবিলের উপর নখের আঁচড় দিতে দিতে আক্ষেপের সুরেই বুঝি বলল, 'কিন্তু আজ আপনার নতুন চেহারা দেখছি। সন্দেহ হচ্ছে, ভুল লোককে নমস্কার করে ফেলি নি তো? আজ তাই আপনার নতুন নাম দিতে ইচ্ছে হল। তাই ঐ নামের কথা বলছিলাম।'

ইস! এর চেয়ে সজোরে গালে একটা চড় দিত যদি দিবা তাহলে অতটা জ্বালা বুঝি তাতে থাকত না।

নীহার একেবারে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। সব তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। সব অনিশ্চিত বলে তার ঠেকল, সবই অদ্ভুত মনে হল, সবই যেন অন্ধকার।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নীহার বলল, 'বুঝলাম না। হঠাৎ আপনার মনের এই বদল, মতের এই পরিবর্তন—'

'উঁহুঁ।' বাধা দিল দিবা, বলল, 'মনের পরিবর্তন দেখলেন কোথায়? মন আমার ঠিক আছে। বদল যা হয়েছে তা কেবল মতের। কিন্তু মত যে বদলাতে হল—তার জন্যে আমি যে খুশি, এমন ভাববেন না। এর জন্যে আমি দুঃখই পেলাম।'

সারা শরীর জ্বলতে লাগল নীহারের, মনে মনে সে বলল, 'ন্যাকা'। মুখে বলল, 'ঠিক আছে। আমিও দুঃখিত।'

পকেট থেকে ব্যাগ বের করল নীহার, দাম চুকিয়ে দিয়ে এবার সে উঠে পড়তে চায়। আর এখানে বসে থাকায় উৎসাহ তার নেই।

দিবা বলল, 'ও কি? পয়সা বার করছেন কেন?'

একটু হাসল দিবা, বলল, 'আপনি বেহালার লোক। আপনি বেপাড়ার লোক। আপনি এখন ভিনদেশী। আমাদের পাড়ায় এসেছেন, আমাদের পল্লীর আপনি অতিথি, সুতরাং এর দাম আমি দেব।'

কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি হল, তর্কাতর্কিও বুঝি একটু হল। কিন্তু দিবা দমতে চাইল না। দামটা সেই-ই চুকিয়ে দিল।

চুকিয়ে দিয়ে বলল, 'যদি কখনো বেহালায় যাই, সেদিন এর শোধ নেবেন, তার মানে এর শোধ দেবেন। সেদিন আমিই তো হব আপনাদের অতিথি।'

ওরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল, রাস্তায় তখন আলো জ্বলে গিয়েছে।

নীহার বিদায় নেবে কি না ভাবছে, আবার ইচ্ছেও হচ্ছে দিবার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করার—তাকে বাড়ি পর্যন্ত পেঁছে দেবার প্রস্তাব করবে এ-রকম ভাবছে। এততেও তার ডেরাটা দেখে আসার লোভ সে সামলাতে পারছে না। ব্যাপারটা কি, আর রহস্যই বা কি!—যার জন্যে মেয়েটা মুখের

উপর এমন সাফ-সাফ কথা বলে বসতে পারে, তা জানার বড়ই ইচ্ছে হতে লাগল নীহারের।

কিন্তু প্রস্তাবটা পেশ করার আগে নীহার একটু ভূমিকা ক'রে নেবার জন্যে বলল, 'মুখের উপর খুব কথা শুনিয়ে দিলেন কিন্তু। এমনটা করবেন এতটা স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'স্বপ্ন দেখেন বুঝি?' দিবা হেসে বলল, 'স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিন। জেগে জেগে একটু ভেবে দেখবেন, কিছু ভুল বলেছি কি না।'

'কিন্তু অত সত্যি কথা বলাও সোজা না।'

'তা ঠিক। সব মেয়ে পারে না। পারে অভিনেত্রীরা। যাদের আপনারা দেখেন অন্য চোখে!' একটু থেমে দিবা বলল, 'অভিনয় করার অভ্যাস আছে বলেই তো কথাগুলো ঠিক স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পেরেছি। হাজার হাজার দর্শকের সামনে কত কঠিন কঠিন কথা বলতে হয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে আর আজ তো ছিল মাত্র একজন দর্শক, একজন মাত্র শ্রোতা, সেখানে বলতে আর আটকাবে কেন?'

নীহার বলল, 'যুক্তিটা ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তারা। তাদের দুটি বেঁটে ছায়া গড়াগড়ি যাচ্ছে তাদের পায়ের কাছে। সেই ছায়ার দিকে চোখ রেখে নীহার বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি? চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে। এখান থেকে কতদূরে আপনার বাড়ি?'

'ধন্যবাদ।' দিবা বলল, 'অনেক দূর-দূর জায়গা থেকে একা-একা ফিরতে হয় কতদিন। একাই যেতে পারব। এগিয়ে দিতে হবে না। আপনাদের মোমিনপুরের ঘাঁটি থেকে শীতের রাত্রেও ফিরি নি একা?'

'অত সাহসের মানে হয় না। হরেশ আর মনোজ তো একদিন এগিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু—'

সেই পুরাতন প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হল না ব'লে নীহার থেমে গেল।

মেয়েটাকে কিন্তু তার বড় হেঁয়ালি ব'লে মনে হচ্ছে, বড় গভীর-জলের-মাছ বলে মনে হচ্ছে মেয়েটাকে। সুতরাং চট করে তাকে ছেড়ে দিতেও ইচ্ছে হচ্ছে না তার। অথচ, তার প্রস্তাবটা নতুন করে আবার পেশ করতেও বিশেষ ভরসা সে পাচ্ছে না।

নীহার বলল, 'এগিয়ে না হয় না দিলাম। বাড়ির নম্বরটা বলুন, রাস্তার নামটা বলুন। আমরা সব ব্যবস্থা ক'রে আপনাকে খবর দেব। অনেকদিন তো ওদিকে যান নি। ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা এগিয়েছি।'

'কিসের কথা বলছেন?'

'বা রে, ভুলে গেলেন? আমাদের সেই অচিনপুরী দেখতে যাওয়ার প্ল্যানটা। আমাদের বলছি বটে, কিন্তু প্রস্তাবটা তো আপনারই।'

দিবার মনে পড়ল। মনে অবশ্য তার ছিলই। কিন্তু নানাভাবে জড়িত থাকায় ও-ব্যাপারে অনেকদিন মাথা ঘামাতে পারে নি। অনেকদিন যেতেও পারে নি সে মোমিনপুরে। কিন্তু যাবে, এবার একদিন যাবে। অচিনপুরীর নায়িকাটিকে দেখার কৌতূহল তার আছে।

দিবা বলল, 'যাব। বাড়ির ঠিকানায় দরকার নেই। এতদিন ঠিকানা না জেনেও যখন কাজ চলেছে, তখন ঠিকানার আর দরকার কি। আপনারা সকলে তৈরি হয়ে নিন্। কবে গেলে সকলের সুবিধে হবে, সকলে এক-সঙ্গে যেতে পারব—ঠিক ক'রে ফেলুন, একদিন গিয়ে হাজির হব, জেনে আসব তারিখটা। চলুন, ঐ ফুটপাথে চলুন। আপনাকে তুলে দিই বাস্-এ। ও কি, চমকে যাচ্ছেন কেন। আমাদের পাড়ার আপনি অতিথি। এটুকু ভদ্রতাও যদি না করি—'

ওরা দুজনে রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল।

বিদায় নেবার আগে নীহারের কি-যেন বলার ইচ্ছে, সে উস্‌খুস করছে, কিন্তু বলতে পারছে না কিছুতে।

হঠাৎ কখন বাস্ এসে পড়বে, হঠাৎ কখন দিবা তাকে ঠেলে তুলে দেবে বাস্-এ, তার বলার কথাটা বলা হবে না—এই ভয়ে নীহার বলল, 'একটা কথা। একটা অনুরোধ। রাখতে হবে কিন্তু।'

সহজ আর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দিবা বলল, 'বলুন।'

বলতে গিয়েও একটা ঢোক গিলে নীহার বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হয়ে গিয়েছে, একথা কাউকে যেন বলবেন না।'

দিবা হেসে ফেলল। কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। তারপর বলল, 'এই কথা? এটা কঠিন কাজ কিছু না। এ অনুরোধ রাখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দিবার মুখের দিকে একবার তাকাল নীহার, নীহার যে নিজে এতটা বেহায়া একথা নীহারেরই আগে জানা ছিল না। নিজের আচরণ দেখে সে নিজেই বুঝি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। তার এ আচরণের কথা তার বন্ধুরা যদি জানতে পারে তবে লজ্জায় সে মুখ দেখাতে পারবে না। এই কথাটা সে ভাবছিল বলেই সংকোচের মাথা খেয়ে দিবাকে অনুরোধটি জানিয়ে ফেলল। এবং দিবার কাছ থেকে অভয় পেয়ে ভয় বুঝি তার কমল একটু।

একটু অন্যমনস্ক হয়তো ছিল নীহার। হঠাৎ কখন বাস্ এসে পড়েছে

লক্ষ্যই করেনি।

দিবা বলল, 'উঠুন। আপনার বাস্ হাজির যে।'

নীহার দৌড়ে গিয়ে হাতল ধরল, বলল, 'আসি। আসবেন কিন্তু একদিন। আমরা সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

হাত নেড়ে দিবা জানাল, আচ্ছা।

বেহালার রায়বাহাদুর রোড কয়েকদিন থেকেই বেশ সরগরম। পল্লীর লোকেরা ঠিক ধরতে পারছে না এদের এত উল্লাস আনন্দ ও আলোচনা কিসের জন্য। মানুষের বয়সটাই একটা ব্যাধিবিশেষ, বিশেষ করে এই বয়সটা। এবং এই বয়সে ব্যাধির প্রকোপ একটু বেশি মাত্রায়ই প্রবল হয়ে ওঠে।

একটা নাটক এরা নামিয়েছে, নতুন আর-একটা নাটক তৈরির জন্যেই এদের এতটা উৎসাহ কিনা—ঠিক ধরতে পারছে না কেউ। স্নেহাংশুর কবি-কবি ভাব দেখে পাড়ার যারা তাকে বিশেষ পছন্দ করত না, তাদের মধ্যের অনেকেই দেখেছে স্নেহাংশুর নাটক। নাটক দেখার পরে স্নেহাংশুর সম্বন্ধে ধারণা তাদের একটু পাল্টেছে। হ্যাঁ, স্বীকার করে তারা, ছেলেটার পার্টস আছে। দিব্যই লিখেছে নাটকটা। যেভাবে প্লট সাজিয়েছে, তাতে তাকে বাহাদুরি দিতে হয়। ফুল্লরা চরিত্রটাকেও ফুটিয়েছে বেশ। অমন নির্জন নিভৃত একটা অট্টালিকায় একা থাকে মেয়েটা, সুতরাং তার চরিত্র যেমনটি বাস্তবিকভাবে হওয়া স্বাভাবিক, নাটকীয়ভাবে তাই-ই হয়েছে। ইতিহাস-ভিত্তিক বটে ঐ ড্রামা, কিন্তু কল্পনার গুণে ও বিন্যাসের কৌশলে নাটকটিকে বর্তমান কালের জীবনের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে এক করে দিয়েছে ঐ নাট্যকার—ঐ স্নেহাংশু বিশ্বাস।

সুতরাং এ পল্লীতে স্নেহাংশুর কদর একটু হয়েছে।

তাই এদের এই জটলা দেখে তাদের একেবারে অশ্রদ্ধা ক'রে উড়িয়ে দিতে পারছে না রায়বাহাদুর রোড।

আর, আর, আর—ফুল্লরার ভূমিকায় নেমেছিল যে মেয়েটি? তার কথা তো সবার মুখে লেগেই আছে। নাট্যকার যেমন প্রশংসা পাচ্ছে, এই নায়িকাও প্রশংসা পাচ্ছে ঠিক ততটাই। ফুল্লরা মেয়েটির চরিত্রটাকে নীতির দিক থেকে জঘন্যই বলতে হবে, কিন্তু সেই ঘৃণ্য চরিত্রটি কেমন সাবলীল-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ঐ মেয়েটা। যে নাটকের অশ্লীল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুবই, নাট্যকারের সতর্ক ভাষার প্রয়োগে তা শ্লীলতা যেমন বজায়

রেখে চলল, নায়িকার প্রকাশভঙ্গির গুণেও তা তেমনি অশালীন হতে পারল না।

অমিয়দের ঘরে বসে কয়েকদিন তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করেছে। আর, তারিফ করেছে দিবার প্রস্তাবটার। মেয়েটা কবি নাকি হে? কল্পনার চোখে ও নিশ্চয় দেখে নিয়েছে তাকে—ফুল্লরা যার নাম। এবার তাকেই সে যাচাই করে দেখে নিতে চায় যে, সে যা দেখেছে ঠিক সে তাই কি না; তাকে যেভাবে দেখিয়েছে নাট্যকার তার সঙ্গে তার মিল কতটা।

ঘরে বসে আলোচনা করতে করতে যখন সমস্ত কথা দানা বেঁধে উঠল তখন তারা বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তার মোড়ে রোদে দাঁড়িয়ে চলল তাদের জল্পনা-কল্পনা।

শীতের সকালের রোদটা বেশ মিষ্টি। তাদের আলোচনার মধ্যেও মিষ্টত্ব আছে বেশ পরিমাণ মতই। তাই সামান্য বিষয়টা নিয়ে এত কথা বলতে তাদের ক্লান্তি নেই। হিমালয়ের শৃঙ্গে উঠতে তারা যাচ্ছে না, তারা যাচ্ছে তো মাত্র এই কিছু দূরে—ঐ সদর রাস্তাটা ধরে কয়েক মাইল মাত্র দূরে—ডায়মণ্ডহারবারে। তার জন্যেই এত কথা।

তাদের এই জটলা দেখে খুশিই হচ্ছে পল্লীর অনেকে। এই ছেলেরা যে কাজের ছেলে তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। এবার বুঝি নতুন কাজে হাত দেবে তারা, নতুন নাটকে?

স্নেহাংশু অমিয় রেবতী মনোজ বিকাশ হরেশ দীপক নীহার বীরেন—এই নবরত্নের সভা চলেছে কয়েকদিন ধরেই।

কয়েকদিন বাদে বোঝা গেল যে, এত কথার কারণ আছে। তারা দল বেঁধে যেতে চায় একসঙ্গে, অর্থাৎ একটা মোটর গাড়ি চেপে। একটা গাড়িতে একটু চাপাচাপি করে বসে না গেলে আর অভিযান কি, আর অমনভাবে না গেলে নাটক জমবে কেন। কিভাবে কার কাছ থেকে জোগাড় করা যায় একটা গাড়ি—এই নিয়েই তাদের এখনকার যত আলোচনা।

কার কার বড়লোক আত্মীয় আছে, কার পরিচয় আছে কোন্ মোটর গ্যারেজের সঙ্গে—এইসব নিয়ে খোঁজখবর করা হল অনেক। কিন্তু কিছুরই কিনারা করা গেল না।

নীহার চুপচাপ থাকে। কোনো কথাতেই কেন-যেন যোগ দিতে চায় না। তার এই ভাবান্তরটা হয়তো লক্ষ্য করছে অনেকেই, কিন্তু ও ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু, নীহারের এভাবে চুপচাপ থাকার কারণ নীহারও জানে, আমরাও জানি। দিবার সঙ্গে তার যে দেখা হয়েছিল, এ কথাটা কাউকে বলতে দিবাকে সে বারণ করে এসেছে কি না—ঠিক মনে

করতে পারছে না নীহার। ঐ উত্তেজনার মধ্যে দিবার সঙ্গে সে কি-কি কথা বলেছে তাও খুঁটিনাটি মনে করতে পারে না নীহার। কিন্তু, তার ভরসা এই যে, মেয়েটার বুদ্ধি আছে, ওসব কথা নিয়ে সে আর আলোচনা করবে না বলেই তার ধারণা।

বীরেন একটু সরল টাইপের, নীহারকে চুপচাপ থাকতে দেখে সে বলল, 'কি হে নীহার! ডুবে-ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে নাকি?'

চমকে উঠল নীহার বসু, হাতে ছিল সিগারেট, সেটা ফুটপাথে ফেলে জুতোর ডগা দিয়ে পিষে দিতে-দিতে বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে', বীরেন বলল, 'তার মানে তুমি এত চুপচাপ কেন। তার মানেই তোমার খোঁজে নিশ্চয় আছে—'

'কি, কি?' বলে উঠল নীহার।

'আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটা মোটরগাড়ি।'

নিরীহ-নম্র সেজে থাকে বীরেন, কিন্তু বীরেনের তো বুদ্ধি আছে, আসল মানুষটাকেই তো এতক্ষণে ধরেছে সে।

দলের আর সাতজন একসঙ্গে যোগ দিল বীরেনের কথায়। বীরেনের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল তারা। সত্যিই তো, নীহার হচ্ছে দি ম্যান, যার হদিশে গাড়ি থাকা সম্ভব। নীহারকে অবিলম্বে যেন সপ্তরথীতে ঘেরাও করে ফেলল।

দীপক বলল, 'আমরা সব কেরানি, শুদ্ধ বাংলায় এখন যাকে বলে করণিক। সুতরাং আমরা অপদার্থ, করণীয় আমাদের কিছুই নেই এসব বৃহৎ ব্যাপারে। তুমি কাজের লোক—দমকলের কর্মী, অনেক লালগাড়ি তোমার হেফাজতে, অনেক গাড়ির মালিকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎপরিচয় থাকা সম্ভব; দ্যাখো-না ভাই একটু ভেবে-চিন্তে। রঙের বাহার দরকার নেই আমাদের, একটা সাদা-মাটা গাড়ি হলেই চলবে, চারটে চাকা থাকলেই হল—'

কথাগুলো বলল বটে দীপক, কিন্তু তার এ কথা অন্যান্য আর সকলের কথাও। সত্যি, যদি পারে তবে নীহারই পারবে।

হরেশও একটু ইন্ধন দিল, বলল, 'হ্যাঁ, মানুষের মত মানুষ বটে তুমি নীহার। চেষ্টা দেখ। কত বিপন্নকে তুমি উদ্ধার করেছ কতবার, কত গল্প করেছ আমাদের কাছে। অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনীও বলেছ, অনেক করুণার কাহিনীও। এবার আমাদের প্রতি একটু করুণা করো—'

'হ্যাঁ।' মনোজ বলল, 'করুণা করে আমাদের রোমাঞ্চিত করে তোলো। তোমার দমটা একবার দেখাও হে, দমকলকর্মী।'

নীহার হাসতে লাগল এদের কথা শুনে, এদের এই কথা তার বিশ্বাস করতে ভালো লাগল। মানুষের মত মানুষ সে? আবার, আবার তার একটু হেসে নিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সকলে তো অমন কথা বলে না। কেউ-কেউ যে আবার বলে অন্য কথা! কিন্তু তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। সে সেদিন কথা দিয়ে এসেছে যে, সব ব্যবস্থা করে রাখবে তারা।

কিন্তু হঠাৎ এমন-একটা ব্যবস্থা করার ভার যে তার উপর পড়বে তা সে ভাবেনি। যদি ভাবা থাকত তাহলে ইতিমধ্যে একটু খোঁজখবরও নিয়ে রাখত সে।

মনোজের কথার কোনো উত্তর দিতে পারল না দমকলকর্মীটি। তার এভাবে নিরুত্তর থাকায় ওদের আশা হল যে, নীহার কিছু-একটা ব্যবস্থা করবে।

অবশ্যই। নীহারও ভাবছে কি করা যায়। ব্যাপারটা তো বেশ মজারই হবে। সত্যি, যদি কাউকে ধরে-করে জোগাড় করা যায় একটা। নীহার ভাবছেই।

ফায়ার ব্রিগেডের মোটর গ্যারেজে অনেক মেকানিকও তো আছে। তারা যদি পারে কোনো খোঁজ দিতে—নীচের দিক থেকেই ভাবতে আরম্ভ করল নীহার। সেদিক থেকে যদি কিছু না হয়, তাহলে উপরতলা থেকে সে খোঁজ নেবে।

এতক্ষণে কথা বলল স্নেহাংশু, কবিত্ব করে বলল, 'কতটা দীন আমরা, কতটা অসহায়। নাটকের প্লট পেয়ে যাই আমরা, আমরা পেয়ে যাই নাটকের নায়িকাও। দু-চাকার সাইকেলও হয়তো জোগাড় করতে আমরা পারি, কিন্তু যেই চাকার সংখ্যা বাড়ে অমনি সংজ্ঞা হারাই আমরা।'

'নাকী কান্না রাখো ভাই, স্নেহ।' মনোজ বলল, 'একটু অপেক্ষা করে দেখতে দাও নীহারের স্নেহ আমরা পাই কি না। কি বলো হে নীহার। একটু মুখ খোলো!

বীরেন মিন্‌মিন্‌ করে বলল, 'মুখ খোলবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছ কেন। কথা আমরা চাই নে, আমরা চাই কাজ।'

একটু দম নিয়ে বীরেন হাসতে হাসতে বলল—

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

হরেশ এগিয়ে এল উল্লসিত হয়ে, বলল, 'সেই ছেলে? সেই ছেলে? সেই ছেলে? সে ছেলে আমাদের চোখের সম্মুখে।'

কিন্তু হাসাহাসিতে কথাটা হাল্কা হয়ে যাচ্ছে না তো? আসল কথাটা

চাপা পড়ে যাচ্ছে না তো? সুতরাং দীপক একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'এইজন্যেই আমাদের দ্বারা কিছু হয় না। কেবল ন্যাকামি ও ভাঁড়ামি নিয়েই আমরা মশগুল থাকতে ভালোবাসি। যাই হোক ভাই, নীহার। এখনই তোমাকে কথা দিতে বলছি নে। কিন্তু চেষ্টা করো।'

নীহার মুখ খোলার আগে ঘাড় নাড়ল, তার পর মুখ খুলে বলল, 'আচ্ছা।'

হরেশ বলে উঠল, 'ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন—মনে রেখো এই বেদবাক্যটি। আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলাম।'

ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে রইল, কিন্তু চিন্তায় পড়ল নীহার। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল সে। আকাশে বা পাতালে কোনো হাওয়াগাড়ি আছে কি না সে খবর সে রাখে না, তবুও তাকে প্রথমে আকাশ-পাতালই ভাবতে হল। দিন-দুই ভাবার পর, সে নিজেও বুঝি একটু নিশ্চিন্ত হল।

জোগাড় হয়েছে একটা গাড়ি। গাড়িটা খুবই ছোট, এবং গাড়িটা তেমন মজবুতও না, রংও একটু চটা। তাই সংকোচ বোধ করছিল নীহার। সংকোচ আর কারো জন্যে না, মাত্র একজনের জন্যে। এমন একটা গাড়িতে উঠতে সে রাজি হলে হয়!

'ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া।' মন্তব্য করল দীপক, গাড়ি জোগাড় হয়েছে এবং গাড়িটা নিয়ে নীহারের একটু সংকোচ আছে, এই সংবাদ শুনে ঐ মন্তব্য করল দীপক।

ওরা আজ মোমিনপুরে এসে জমায়েৎ হয়েছে। শুভ সংবাদটি পেয়ে তারা এসেছে এখানে। গাড়ি জোগাড় হয়েছে।

প্রাণে এদের পুলক এসেছে, প্রাণে এসেছে উল্লাস। হোক সে গাড়ি ছোট, হোক সে গাড়ি রং-চটা। মনে তাদের যথেষ্ট রং আছে, এবং দিল্ তাদের যথেষ্ট বড়—সুতরাং পুষিয়ে যাবে, কুলিয়ে যাবে।

তিনটে জিনিস এখন দরকার। প্রথম, পেট্রলের খরচ; দ্বিতীয়ত, ড্রাইভার; আর তৃতীয়, তৃতীয় হচ্ছে দিবা।

পেট্রলের জন্যে ভাবনা নেই, চাঁদা তুলে তার দাম তুলে নেওয়া যাবে, ড্রাইভারের জন্যে ভাবতে হবে না, নীহার তা জোগাড় করবে। কিন্তু এতেও এ সমস্যার সমাধান হল না, কেন না গাড়ি এত ছোট যে, এদের নিয়ে ড্রাইভারের জায়গা আর কুলোবে না।

'তবে ড্রাইভার থাক।' দীপক বলল, 'দরকার নেই ড্রাইভারের।'

দীপকের প্রস্তাব শুনে চমকে উঠল সকলে, বিনা ড্রাইভারে গাড়ি চলবে কি করে?'

'পেট্রলে। তেল দিয়ে দুনিয়ার সব কাজ হাসিল করা যায়, আর গাড়িতে তেল দিয়ে ড্রাইভার বাদ দেওয়া যাবে না?' দীপক আবার বলল।

'ওসব বাজে কথা রাখো। ক'জন যাব আমরা, ঠিক করো।' হরেশ বলে উঠতেই সমস্বরে সকলে বলল, 'সকলে।'

কিন্তু গাড়িতে চালক সমেত ঠেসেঠুসে মানুষ ধরবে ছয়জন। নবরত্ন সভার চারটি রত্নকে বাদ দিলে থাকবে পাঁচ, আর তার সংগে যুক্ত হবে শ্রেষ্ঠ রত্নটি, অর্থাৎ দশম রত্ন দিবা। এই মোট ছয়।

নীহার বলে উঠল, 'ঠিক আছে। আমিই চালাব, যা থাকে বরাতে।'

'পারবে?'

'যা কাজ করি, তাতে সব অভ্যেসই রাখতে হয় ভাই।'

ড্রাইভার-রূপে অন্তত নিজের আসনটা পাকা করে নিয়ে নীহার নিশ্চিন্ত হল, কিন্তু অন্য অনেকের মুখ তখন ফ্যাকাশে।

গাড়িতেও জায়গা নেই, কিন্তু সকলেই যেতে চায়। অগত্যা অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অমিয় তরফদার বলল, বরাতের কথা যখন তুলেছে নীহার, তখন সব বরাতের উপরেই ছেড়ে দাও। লটারি করা যাক।'

লটারি করাই ঠিক হল অগত্যা। নীহারকে বাদ দিয়ে লটারি করা হল, নীহার গাড়ি চালাবে, তার থাকা চাই।

বাকি আটটির মধ্যে চারটি নাম চাই এখন। আটটি নাম লেখা হল আট টুকরো কাগজে। কাগজের টুকরোগুলি ভাঁজ করে করে খুব ছোট করে ফেলা হল। তারপর সেগুলি পকেটে পুরল অমিয়। পকেট বেশ নেড়ে নিল।

নীহার যাচ্ছেই, নীহার তাই নিরপেক্ষ। অমিয়র পকেটে হাত ঢুকিয়ে নীহার একটা একটা ক'রে চারটি টুকরো বের ক'রে আনল।

খোলা হল পুরিয়া। একে একে নাম বেরোল—হরেশ স্নেহাংশু মনোজ দীপক। বাদ পড়ল অমিয় রেবতী বিকাশ বীরেন। শেষের চারজন চুপ ক'রে রইল।

অমিয় বলল, 'জীবনটাই জুয়া খেলা। হারজিৎ আছেই। এর জন্যে দুঃখিত হবার মানে হয় না।'

এদিকের পঞ্চরত্ন তাহলে প্রস্তুত। পেট্রলের চাঁদাও উঠবে। ড্রাইভারও নির্বাচিত। এখন বাকি রইল—

বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শুনে দীপক বলে উঠল 'কে?'

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আগন্তুক বলল, 'আমি দিবা।'

'শতং জীব, শতং জীব। শতায়ু হোন্।' উঠে দাঁড়াল দীপক, বলল, আসুন, আসুন। আমাদের সব তৈরি, সব ব্যবস্থা পাকা। আপনার কথাই ভাবছি, এমন সময়ে আপনি সশরীরে—'

দীপকের এতটা উৎসাহ দেখে নীহারের শরীর জ্বলে উঠল, একবার মাত্র দিবার মুখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল নীহার।

দিবা ধীরে ধীরে নীচু হতে হতে বসল। স্কার্ফটা গায়ে একটু ভালো ক'রে জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিসের কথা বলছেন?'

'বা রে। আমাদের সেই যাত্রা—'

'আবার যাত্রা কেন?' বাধা দিয়ে বলল দিবা, 'হচ্ছিল তো থিয়েটার।'

'হ্যাঁ। তাই হচ্ছিল, তাই হবে। কিন্তু নায়িকাকে দেখার জন্যে আমাদের যাত্রা করার কথা ছিল না?'

'ওঃ, এই কথা! ভালো খবর। কবে যাওয়া?'

স্নেহাংশু ওপাশ থেকে বলল, 'পরশু।'

দেখতে-দেখতে এসে গেল সেই শুভদিন, এসে গেল সেই পরশু।

কোনোরকম দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই; কোনো ভাবনাও বুঝি নেই; স্নেহাংশু মনোজ হরেশ দীপক আর নীহার—এই পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে দিবা—দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃদু হেসে দিবা বলল, 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছা আজ পূরণ হতে চলেছে। আজ আমার আনন্দ লাগছে, সত্যিই খুব আনন্দ লাগছে আজ আমার।'

ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে দিবার একার নয়, ওদের সকলেরই সমবেত ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে আজ। স্নেহাংশুর নাটকের নায়িকাকে আবিষ্কার করার জন্যেও তাদের ইচ্ছা যেমন ছিল, সেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যিনি সেই মঞ্চাভিনেত্রীকেও আবিষ্কার করার ইচ্ছা তাদের প্রবল। এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে আজকের এই অভিযানটিও কম রোমাঞ্চকর নয়।

প্রাণের আনন্দ ঘোষণা করার মত ক'রে স্পষ্টভাবে দিবা জানাল তার মনের ভাবটা। কিন্তু আর কেউ তেমন ক'রে তাদের মনের ইচ্ছা ঘোষণা করল না। কিন্তু তাদের মনের মধ্যেও অসম্ভব আনন্দ আজ। এবং আনন্দটা বুঝি নীহারেরই সবচেয়ে বেশি।

মোমিনপুরে এসে জমায়েত হবার কথা হয়েছিল আগে, কিন্তু এই পৌষ মাসের কড়া শীতে বেহালার থেকে উল্টোপথে গিয়ে হাজির হতে রাজী হল না অনেকেই। সুতরাং ঠিক হল, ওরা এসে মিলিত হবে তাদের রায়বাহাদুর রোডেই।

এখান থেকে যাত্রা করল তাদের গাড়ি। পাড়ার ছেলেছোকরারা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগল অভিনেত্রীটিকে। মঞ্চে একে দেখেছে তারা, কিন্তু এমন কাছে থেকে এমন আটপৌরে চেহারা তারা আগে দেখে নি, তাই তাদের এই কৌতূহল।

পাঁচজন পুরুষ আর একজন নারী গাড়ির মধ্যে বসেছে ঠাসাঠাসি ক'রে। অজস্র ধোঁয়া ছেড়ে, প্রচুর শব্দ ক'রে ছাড়ল গাড়িটা।

পাড়ার ছোকরারা মন্তব্য করল সংক্ষেপে—'দ্রৌপদী'।

বেহালার বড় রাস্তা ধরে ঐ চলে যাচ্ছে ক্ষুদে গাড়িটা। ঐ গাড়ির দিকে চোখ রেখে মুখরোচক আলোচনা আরম্ভ করল তারা। লজ্জা নেই সংকোচ নেই—অতগুলো পুরুষের মধ্যে দিব্যি আঁট হয়ে বসে দিবা দেবী চলেছেন অভিযানে।

একজন বলল, 'ওসব মেয়েরা সব পারে। ওরা আলাদা জাতের।'

অন্যজন বলল, 'যাচ্ছেতাই। থার্ড ক্লাস।'

তৃতীয় জন বলল, 'ওদের নাম নাকি পতিতা। বাজে কথা। ওরাই পঞ্চপুরুষের পতি।'

এই মন্তব্যে সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে। এবং তার পরে দিবাকে নিয়ে তারা যেসব আলোচনা আরম্ভ করল এখানে তা লিখে রাখা যায় না।

এরা আলোচনা করুক ওদের নিয়ে। আমরা ওদের এখানে ফেলে রেখে, আসুন, অনুসরণ করি ওদের ঐ গাড়িটা।'

ওদের প্রাণে প্রবল প্লাবন এসে গিয়েছে। উল্লাস করতে-করতে চলেছে ওরা। অট্টহাস্যের শব্দ ছড়াতে-ছড়াতে চলেছে ওরা। ওরা সমস্বেত গলায় গান গাইছে। পুরনো মডেলের বাচ্চা গাড়িটা সেই গানের সঙ্গে তাল মিলাতে-মিলাতে ইঞ্জিনে প্রচুর শব্দ তুলে চলেছে। আশপাশের গাড়ি ও বাড়ি পার হতে-হতে চলেছে তারা। চারদিক যেন উচ্চকিত করে চলেছে।

অনেকগুলো বাঁক পার হয়ে এসেছে তারা। অতটুকু একটা গাড়িতে এমন ঠাসাঠাসি ক'রে বসে কোথায় চলেছে এই এক-ঝাঁক মানুষ—এমন প্রশ্ন রাস্তার মানুষের মনে জাগিয়ে দিতে দিতে তারা চলেছে।

বড়িশা শখের-বাজার ঠাকুরপুকুর পার হয়ে গিয়েছে তারা। ক্রমে-ক্রমে

তারা অতিক্রম করে গেল পৈলান ভাসা খড়িবেড়িয়া। তারপর উদয়রামপুর ছাড়িয়ে আমতলায় এসে তারা একটু থামল।

নীহার গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশে আছে স্নেহাংশু আর মনোজ। পিছনের সীটে দিবার সঙ্গে আছে হরেশ আর দীপক।

গাড়িতে জল নিতে হবে। এই ঠান্ডার সকালেও ইঞ্জিন তেতে আগুন হয়েছে।

নীহার ওপাশ থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'শরীরের আড় ভেঙে নাও সকলে। কেউ যদি ইচ্ছে কর, জায়গা বদল ক'রে নিতে পার। স্নেহাংশু আর মনোজ পিছনে চলে যেতে পার। দীপক আর হরেশ চলে আসতে পার সামনে। একটু অদল-বদল ক'রে না নিলে জার্নিটা বড় হ্যাকনিড ঠেকে।'

নীহারের প্রস্তাবটা এমন যে, এ'তে কেউ না বলতে পারে না। বিশেষ করে দীপক আর হরেশ তো পারেই না। সুতরাং ওরা দুজনেই সবার আগে সবচেয়ে জোর গলায় নীহারের প্রস্তাব সমর্থন করে উঠল, বলল, 'ঠিক। জার্নিতে বৈচিত্র্য চাই। কি বলেন?'

ব'লে ওরা তাকাল দিবার দিকে, দিবা সামান্য-একটু হেসে বলল, 'জায়গা বদল করলেই যদি বৈচিত্র্য আসে, তাহলে মন্দ কি।'

মনোজ আর স্নেহাংশু গা-মোড়ামুড়ি দিল। মনোজ ছোট একটু হাই তুলে নিয়ে বলল, 'আমাকে যেখানে বসতে বলবে সেখানেই আমি রাজী। যে উদ্দেশ্যে আমরা পথে নেমেছি, সেটা সিদ্ধ হলেই হল।'

দিবা বলে উঠল, 'ঠিক। স্নেহাংশুবাবুর নায়িকাকে আমরা নিজেদের চোখে দেখতে চাই।'

মনোজ বলল, 'বটেই তো! স্নেহাংশুর নায়িকা তো আপনিও। আপনাকেও আমরা আজ পেতে চেয়েছি একটু অন্তরঙ্গভাবেই। এবং এ কথা প্রকাশ করতেও বাধা নেই যে, আমাদের সে আশা পূরণ হয়েছে।'

মনোজের মুখের দিকে চেয়ে দিবা বলল, 'হয়েছে বুঝি? শুনে সুখী হলাম।'

ইঞ্জিনে জল ঢালছিল নীহার, সে একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকাল মনোজের দিকে। নীহারের এই বক্রদৃষ্টিটা লক্ষ্য করল দিবা। লক্ষ্য করে সে মজা পেল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু, রাস্তার মধ্যেই একটা ড্রামা যে জমে উঠেছে, এটা সে ভালোভাবেই বুঝতে পারল। কিন্তু ড্রামা ক'রে-ক'রেই যার জীবন কাটছে, তার কাছে এ ড্রামাটা বিশেষ গুরুতর বলে মনে হল না।

দুই পাশে মনোজকে আর স্নেহাংশুকে বসিয়ে দিবা পিছনের সীটে আসন নিল। নীহার স্টার্ট দিল গাড়িতে। তার বাঁ পাশে বসল দীপক আর হরেশ।

গাড়িটা চালাবার ভার নিয়ে নীহার এই অভিযাত্রী-দলে তার জায়গাটা পাকা করে নিয়েছে বটে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে যে, কাজটা বড়ই কাঁচা হয়েছে। ওরা চলেছে দিব্য আরামে, দিব্য মেজাজের সঙ্গে; আর সে চলেছে সবার থেকে একেবারে আলাদা হয়ে। তার সব নজর কেবল রাস্তার দিকেই।

একে-একে তারা পার হয়ে চলল রাজারহাট সিরাকোল শিবানীপুর। তারপর এল উস্থি, এল সরিষা, এল কলাগাছিয়া। প্রায় এসে গিয়েছে তারা। ডায়মণ্ডহারবার আর বেশি দূরে নয়। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত তারা যেতে চায় না। তাদের যাবার জায়গাটা হচ্ছে ডায়মণ্ডহারবারের একটু আগে।

গাড়ি থামিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করে নিল সংগ্রামপুর রেলস্টেশনে যাবে কোন্ পথে।

যা শুনল তাতে তারা বুঝতে পারল যে, তারা একটু এগিয়েই এসে পড়েছে। উস্থি থেকে বাঁয়ে বাঁক নিলেই তাদের পক্ষে সুবিধে হত। এখান থেকে বাঁক নিলেও যাওয়া যাবে বটে, কিন্তু রাস্তা ভালো না, কিছুটা মাঠের উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে হবে। তাতে অসুবিধা আছে।

অত অসুবিধেয় আর দরকার নেই, নীহারের মেজাজও বিশেষ ভালো না। তাই, আর কথা না বাড়িয়ে নীহার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলল উস্থির দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা পেঁছে গেল উস্থির মোড়ে। আর জিজ্ঞাসার দরকার নেই। নীহার ডান দিকে একটা বাঁক নিয়ে গাড়িতে স্পীড দিল।

কিছুটা এগিয়েই তারা পেল একটা জলের ধারা। এটাকে নদী হয়তো ঠিক বলা যায় না। কিন্তু নদীর মতই দেখতে। অবশ্য জল খুব কম। তার প্রায় কিনার দিয়ে চলেছে কাঁচা রাস্তা। আস্তে আস্তে নীহার গাড়ি চালাচ্ছে।

হঠাৎ তাদের কানে এল হুইস্‌ল—ট্রেনের হুইস্‌ল। ওরা বুঝতে পারল যে, ওরা রেললাইনের কাছাকাছি এবার এসে পড়েছে।

সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে-চালাতে নীহার বলে উঠল, 'মাই ডিয়ার স্নেহাংশু, বী রেডি। তোমার নায়িকার নিকেতনের কাছাকাছি এবার আমরা

এসে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে যেন। চারিদিকে লক্ষ্য রাখো, কোন্ ডেরায় থাকেন তোমার সেই ফুল্লরা—একটু দেখে বোলো।'

প্রত্যেকেই বিশেষভাবে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এতটা ব্যস্ততার হেতু যে কি, তা অবশ্য বলা বড় কঠিন। দূর থেকে এক-লহমার জন্যে দেখা একটি চেহারা নিয়ে কাব্য হতে পারে, নাটক হতে পারে, কৌতূহলও হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে এতটা ব্যস্ত হবার হয়তো সঙ্গত কোনো মানে বের করা শক্ত।

গাড়ির মধ্যে বসে সারাটা রাস্তাই তারা হৈ হৈ করতে-করতে এসেছে। কিন্তু এখন তারা সকলেই নীরব ও নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে।

স্নেহাংশুর বুঝি বুক কাঁপছে। কি রকম অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে, কি-রকম মানুষের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হবে—হয়তো সে ভাবছে এইসব কথা। সে ভাবছে, সেইজন্যে কোনো কথা সে বলছে না। নীহারের কথার কোনো উত্তরও সে দিল না।

কিন্তু একটা ভরসা বুঝি তাদের আছে। সে ভরসা দিবা। সঙ্গে একজন মহিলা থাকলে অনেক সময়ে অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়।

স্নেহাংশু গলাটা একটু সাফ ক'রে নিল, তারপর নীহারকে বলল, 'একটু আস্তে চালাও। এসে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে। ঐ যে প্রাচীর দেখছ—'

দুপাশের দুজনের চাপে বন্দিনীর মতন হয়ে বসে ছিল দিবা। সেই চাপ থেকে নিজেকে একটু মুক্ত করে নেবার চেষ্টা ক'রে সে সোজা হয়ে বসতে-বসতে বলল—'ঐটে নিশ্চয়, উঃ, মস্তবড় বাড়িটা তো!'

স্নেহাংশু বলল, 'হুঁ। কিন্তু আপনাকে নিতে হবে সব দায়িত্ব। আপনি মহিলা, আপনি এগিয়ে যাবেন সকলের আগে। মনে থাকে যেন।'

দিবা বলল, 'মনে রাখলাম।'

চারদিকে জীর্ণ প্রাচীরের বেড়া দেওয়া বৃহৎ একটি প্রাঙ্গণের মাঝখানে বিরাট একটা অট্টালিকা সর্বাঙ্গে ফাটল নিয়ে একেবারে একা দাঁড়িয়ে আছে। বড় করুণ দেখাচ্ছে বাড়িটা। আশেপাশে লোকালয়ও বুঝি নেই।

ওরা একে-একে নামল গাড়ি থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকাতে লাগল ওরা। যাকে তারা একটা প্রাসাদ বলে মনে করে রেখেছে, সেটা যে এখন আর প্রাসাদ নেই, তা স্পষ্ট দেখতে পেল তারা। এটা একটা বিশাল বাড়ি বটে, কিন্তু এটা এখন নিছক

ভাঙা বাড়ি। অথবা, একে বলা যায় একটা বিরাট প্রাসাদের কঙ্কাল মাত্র।

অনেক উৎসাহ নিয়ে এসেছে তারা অনেক দূর থেকে, কিন্তু এখানে এসে হাজির হয়ে তারা সকলেই অল্পবিস্তর থতমত খাচ্ছে। জীর্ণ হোক, দীর্ণ হোক, জনমানবহীন হোক—তবুও তারা ঐ প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতে পারছে না। যদিও, ফটক ঠিক কোন দিকটায় এখনো তারা তার কোনো হদিশ পায় নি; কিন্তু ফটকের বিশেষ দরকারও নেই। অজস্র জায়গায় ভেঙে গিয়েছে প্রাচীর, তার যে-কোনো ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাওয়া যায়।

দূরে কয়েকটা গাছ-গাছড়ার উপর দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে চলে গেল ট্রেন—ডায়মণ্ডহারবারের দিক থেকে কলকাতার দিকে। এইরকম একটা ট্রেন থেকে স্নেহাংশু তার আবিষ্কৃত নায়িকাটিকে দ্বিতীয়বার দেখার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল ব'লে তার মনে পড়ছে।

মনোজ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে যেন মজা দেখছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান—'

সকলেরই এগোবার ইচ্ছা, কিন্তু তার মধ্যে থেকে নীহারই এগিয়ে এল সকলের প্রথমে। একটা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বীরবিক্রমে এতদূর এসে এখানে দাঁড়িয়ে থতমত খাওয়াটা তার কাছে বড়ই কাপুরুষের কাজ বলে মনে হচ্ছিল, দু'পা এগিয়ে গিয়ে নীহার আড়চোখে দিবার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়েই বলল, 'চলে এসো। পুরুষমানুষের অত ভয় পেলে চলে না। বী ব্রেভ। বী এ ম্যান। আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই—চলে এসো।'

নীহার প্রায় ঢুকে পড়েছিল, এমন সময়ে মনোজ বলল, 'এই, একটু দাঁড়াও। লেডিজ ফার্স্ট, এঁকে যেতে দাও আগে।'

দিবা যেন নির্বিকার নির্লিপ্ত, দিবা যেন নির্ভীকও। যে জায়গাটায় বেশ বড় হয়ে ভেঙে পড়েছে প্রাচীর, সেই জায়গাটার ভাঙা ইট ডিঙিয়ে সে ভিতরে গেল, বলল, 'আসুন, আসুন-না আপনারা।'

স্নেহাংশু যেতে যেতে বলল, 'যা থাকে বরাতে। ট্রেসপাসের দায়ে যদি পড়তে হয়, না হয় পড়ব। দল বেঁধে ফাটক খাটব তাহলে।'

মনোজ আশ্বাস দিল সকলকে, বলল, 'দূর ট্রেসপাস। বিপদে পড়লে একেবারে বেকুব সেজে যেতে হয়। কেউ এসে যদি চার্জ করে, তখন তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, একেবারে না বুঝে এই অন্যায়টা করে ফেলেছি। বেকুবদের কেউ বকে না, করুণা করে।'

বুকে যথেষ্ট বল সঞ্চয় ক'রে ওরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভিতরে এখন আগাছার ভিড় ও জঙ্গল। মাঝে-মাঝে কয়েকটা শ্বেতপাথরের মূর্তি

বসানো। মূর্তিগুলিকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে লতা। লতাপাতার আবরণে মূর্তিগুলোর চেহারাও ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

ওরা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো দিক থেকে কোনো বাধা আসছে না। মানুষের কথা দূরের, কোনো কাকপক্ষীও বুঝি লক্ষ্য করছে না তাদের। এ'তে ক্রমশ তাদের মনের দ্বিধা কমে আসতে লাগল যেমন, সাহসও যেন বেড়ে উঠতে লাগল সেই অনুপাতে।

গলা ছেড়ে কথা বলতে লাগল ওরা। একটু হাসাহাসিও করতে লাগল।

হরেশ কোনো কথার মধ্যে নেই। গাছের একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে নিজের মনেই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তারও যেমন মন নেই কারও দিকে, তার দিকেও তেমনি মন নেই কারও।

দিবা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে অবশেষে বলল, 'এখানে আমরা কি জন্যে এলাম, তাই আমরা ভুলে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে যেন। গাছ আর আগাছার মধ্যে পায়চারি করার জন্যেই বুঝি আমাদের এতদূরে আসা?'

'তা কেন, তা কেন।' দীপক বলল, 'আমরা এসেছি নায়িকার সন্ধানে। তাকে এবার খুঁজে বের করতে হবে।'

'তবে, চলুন সকলে ওদিকে যাই।'

কিন্তু সকলের চোখ পড়ল পিছনের দিকে। হাতের ডাল দিয়ে টেনে টেনে মূর্তির গায়ের লতা ছাড়াচ্ছে হরেশ। বলছে, 'কী চমৎকার মূর্তি, তার কি অবস্থা হয়ে আছে।'

একটা মূর্তির গা থেকে প্রায় সমস্ত লতা নামিয়ে ফেলেছে হরেশ। আবরণহীন একটি নারীমূর্তি বেরিয়ে এসেছে সেই লতার অন্তরাল থেকে। শীতের সকালের ঠাণ্ডা রোদ এসে পড়েছে ঐ শ্বেতমূর্তির গায়ে—অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ঐ চেহারা।

দিবাও তাকাল মূর্তিটার দিকে। তারও ভালো লাগল অবশ্যই, কিন্তু কোনো মন্তব্য সে করল না। ওরা হয়তো একটু তামাশা করার মতলব করেছিল, কিন্তু নিঃসংকোচে দিবাকে ঐদিকে তাকাতে দেখে ওরা থেমে গেল।

কিন্তু কোনো কথা না বললে তো নয়। মনোজ তাই কিছুক্ষণ ঐদিকে চেয়ে দেখল, ঐ সৌন্দর্যে যেন মুগ্ধ হয়েছে এইভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ঐদিকে, তারপর কপালের উপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবার জন্যেই বেশ স্পষ্টভাবে বলল—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
অমৃতসরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

হঠাৎ এখানে ঐ কয়টি ছত্র শুনে কেউ চমকাল কি না লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু বড় লাগসই লাইন এখন আউড়ে দিয়েছে মনোজ, এজন্যে মনে-মনে অনেকেই বুঝি তারিফ করল তাকে।

ঐ মূর্তিটা তার পাথুরে চোখে এমন প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে যে, ঐ দু চোখে সত্যিই যেন দেখা যাচ্ছে দিব্য বিভা এবং ঐ মূর্তির সর্বাঙ্গে যে শীতল শান্তি ছড়ানো আছে, তাও যেন তারা অনুভব করতে লাগল। এবং তাদের এই অনুভূতি তাদের বেশ আরামই দিতে লাগল।

দু'বার ঢোক গিলল দিবা। তার গলা কেমন কাঠ-কাঠ হয়ে উঠেছে। তার চোখ-দুটোও যেন একটু বেশি চকচক ক'রে উঠেছে। হয়তো নতুন করে চকচক করে ওঠে নি, হয়তো ঐ রোদ এসে পড়ায় হঠাৎ একটু চকচকে দেখাচ্ছে।

মনোজ অভিনয়ে দক্ষ। নানা রকম নাটকে সে নেমেছে। অনেক রকম ভূমিকার সঙ্গে তাই তার পরিচয়। অনেক কবিতাও তার কণ্ঠস্থ। দক্ষ অভিনেতার গলায় তার এই লাগসই লাইন-ক'টির আবৃত্তি তাই ভালো লেগেছে সকলের।

সকলেই মনে-মনে তারিফ করেছে, কিন্তু মন্তব্য কেউ করে নি। কিন্তু মন্তব্য করল দিবা, বলল, 'চমৎকার। আর-একবার বলুন তো, এক্ষুণি যা বললেন।'

মনোজ উৎসাহ পেয়ে গেল, বলল, 'ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে গলা ধরে গিয়েছে, সবটা দরদ দিয়ে বলতে পারব না, তবু বলছি—' গলাটা একটু সাফ ক'রে নিয়ে মনোজ বলল—

কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
অমৃতসরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

মনোজের আবৃত্তি শুনে, কেবল যেন মুগ্ধ নয়, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছে দিবা। সেও দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরনির্মিত একটা মূর্তির মত অনড় হয়ে।

চাপা গলায় হরেশ বলল, 'এই এই এই—'

সকলে একসঙ্গে তাকাল ঐ দালানের দিকে, দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা মূর্তি—অনড় অটল প্রস্তরমূর্তির মত।

এখান থেকে, এত দূর থেকে, দেখা যাচ্ছে, ঐ মূর্তিটা অতি স্পষ্ট। মৃদু সূর্যের আলোয় বড় মোলায়েম দেখাচ্ছে মূর্তিটা।

হরেশ চাপা গলায় আবার বলল, 'চোখ-চোখ। কী ভীষণ এক জোড়া চোখ, কী ভয়ংকর সুন্দর।'

ঐ চোখ দেখে এর আগেও বুঝি অনেকে চমকে গিয়েছে। চমক লাগানোর মতই চোখ বটে।

মনোজ বাধা দিয়ে উঠল, বলল, 'চুপ চুপ।'

ওরা সকলে আজ এখানে অতিথি, ওরা আগন্তুক। দোতলার বারান্দার দিকে মুখ ক'রে তারা করজোড়ে নমস্কার করল। ওরা আশা করেছিল তারা তাদের এই নমস্কারের উত্তর পাবে। কিন্তু আশ্চর্য, দেখেও যেন দেখল না এদের, এদের নমস্কারের উত্তরে একটা নমস্কারও জানাল না। সামান্য এটুকু সৌজন্য ওরা প্রত্যাশা করেছিল, না পেয়ে হতাশ হয়ে গেল ওরা, একটু ক্ষুণ্ণও বুঝি হল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অনড় মূর্তিটা নড়ে উঠল। কাঁধের উপরে আঁচলটা টেনে নিয়ে বারান্দা ত্যাগ ক'রে চলে গেল ভিতরে।

'অহংকার!' দিবা বুঝি বিরক্তি চাপতে পারল না, বলল, 'অভদ্র।'

স্নেহাংশুর তবে দিব্যদৃষ্টি আছে। যেভাবে সে চিত্রিত করেছে এই চরিত্রটা তার জন্যে তাকে এখন যেন দ্বিগুণভাবে তারিফ করতে হয়।

ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওরা কি-যেন ভাবল কিছুক্ষণ। ওরা আশা করল, ভিতরে গিয়ে কাউকে খবর নিশ্চয় দিয়েছে ওই মহিলাটি এতক্ষণে, এখনি কেউ-না-কেউ এসে পড়বে, এবং তাদের চার্জ করবে।

এই আশা এবং এই আশঙ্কা নিয়ে চুপ করে ওরা অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু কেউ এল না দেখে একটু অধৈর্যই বুঝি হয়ে উঠল সকলে।

নীহার বলল, 'খুব হয়েছে। এবার ফিরে চলো, ফিরে চলো আপন-ঘরে। এইরকম একটা গান আছে না, গানটা এবার বড় গাইতে ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে।'

নীহারের প্রস্তাব শুনে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত যে হল, সে দিবা। সে বলল, 'ফিরে তো যাবই। এখানে আমরা কেউই থাকতে আসিনি। কিন্তু যাবার আগে একটু দেখা করে যাব, একটু আলাপও করব।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে রীতিমতভাবে ফুটে উঠেছে যেন প্রতিজ্ঞা ও প্রতিহিংসা। খুবই

অপমান বোধ সে করেছে। যদি তারা বিনা-অনুমতিতে এখানে ঢুকে পড়ে কোনো অন্যায় ক'রে থাকে তাহলে তার জন্যে তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হোক। তা যদি চাওয়া হত তাহলে তার একটা মানে পাওয়া যেত। কিন্তু এভাবে উপেক্ষা করে এতটা অবজ্ঞা প্রকাশ করায় সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছে নিশ্চয় দিবা। তা না হলে সে অমন কঠিন মূর্তি নিয়ে দাঁড়াল কেন।

দিবা বলল, 'আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।'

ব'লেই সে হাঁটা দিল। আগাছা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে সে চলল।

ওরা বাধা দিল না, উৎসাহও দিল না। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—ঐ যাচ্ছে দিবা। একবারও ফিরে তাকাচ্ছে না সে। এখান থেকে দালানটা কিছুটা দূরেই। ওখানে গিয়ে পৌঁছতেও কিছুটা সময় তার লাগবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল দিবা। সে ঢুকে পড়েছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। এতটুকু দ্বিধা না করে সে সোজা চলে গেল ভিতরে।

হরেশ বুঝি একটু অবাক হয়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, 'যতটা নরম মনে হয় তা বোধ হয় নয়। এ ভীষণ মেয়ে একটা। অচেনা-অজানা জায়গা। ভূতুড়েবাড়ির মত একটা বাড়ি। ভেতরে বাঘ আছে, না, ভাল্লুক আছে জানা নেই—চট করে চলে গেল ভেতরে? না, এ তো যেমন-তেমন মেয়ে না হে! পর্বত-অভিযানে গেলে এ নিশ্চয় দলের লীডার হতে পারবে।'

'তা তো পারবে। কিন্তু অতটা বেপরোয়া হওয়া কি ঠিক? একটু পরামর্শ করা নেই, একটু আলাপ-আলোচনা করা নেই; আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আসছি—এই রকম একটা ঘোষণা করেই রওনা। বা, বা রে মেয়ে!' বেশ বিরক্ত হয়েই কথাগুলো বলল নীহার।

কিন্তু বিরক্ত হওয়ার এতে আছে কি? পুরুষদের পক্ষে যা সম্ভব হল না, তা যদি একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে তাকে তারিফ করাই দরকার। কিন্তু এখন তারিফ করার মত মেজাজ নেই কারো। সকলেই একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাচীরের ওপারে ঝিরঝিরে জলের ধারাটার পাশে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তাদের গাড়িটা, একেবারে অনড় হয়ে, ওরাও তেমনি প্রাচীরের এপাশে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল মূর্তিতে। আশেপাশে লোকালয় নেই বলে রক্ষে, তা না হলে তাদের এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এতক্ষণে ভিড় জমে যেত নিশ্চয়।

বাইরের কোনো ভিড় এখানে জমলো না বটে, কিন্তু ওরা পাঁচজনই একটা ভিড় সৃষ্টি করে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভারি মজার একটা জায়গায় তারা যে এসে পেঁাছেছে এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। ওদের আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য ছিল মাত্র দুটি প্রাণী, সে দুজন হচ্ছে দিবা ও স্নেহাংশু। কেন, নাটক লিখতে হলে তার নায়িকা জোগাড় করতে হবে এমন একটা বনবাদাড় থেকে? কেন, নায়িকা কি পাওয়া যায় না হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে। দেখার চোখ থাকা চাই। তেমন চোখ থাকলে একেবারে পাশের মানুষটির মধ্যে থেকেও পরমবস্তু আবিষ্কার করা যেতে পারে। তেমনভাবে যদি আবিষ্কার করত তাদের স্নেহাংশু, তাহলে সেই বেহালার রায়বাহাদুর রোড থেকে এমন বাহাদুর সেজে তাদের আসতে হত না এতদূর। আর, দ্বিতীয়টি—ঐ দিবা দেবীটি! মুখে রং মেখে মঞ্চে উঠে একটু-আধটু ফষ্টিনষ্টি করা আর চোখের আর ভুরুর একটু ভঙ্গি করা যার কাজ, সে কি না—

'ইয়েস', দীপক বলল, 'ঠিক কথা। নিজেদেরই গাল না দিয়ে পারছি নে। মহিলাটি ভীষণ মহিলা। আমাদের মতন স্মার্ট ইনটেলিজেণ্ট আর শার্প পাঁচটি ইয়ংম্যানকে একেবারে নাচিয়ে ছাড়ল, একেবারে, ইয়ে, বাঁদরনাচ!'

'তা ঠিক।' মনোজ বলল, 'গায়ে লাগছিল যখন ঠাণ্ডা হাওয়া, তখন গাড়িটার মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে আঁট হয়ে থাকার সময় আমরা কিন্তু বুঝতেই পারি নি যে, কার অঙ্গুলিনির্দেশে আমরা চলছি। তখন হয়তো ঐ আমেজটা অনুভব করছিলাম, আর মনে-মনে আবৃত্তি করছিলাম—'

'কি কি?' জিজ্ঞাসা করে উঠল দীপক।

'আবৃত্তি করছিলাম—অমৃতসরস তোমার পরশ। আর, আর—'

আলোচনাটা একটু সরস হয়ে ওঠায় ওদের মন বুঝি একটু হাল্কা হয়েছে। সকলে নড়ে-চড়ে এমনভাবে দাঁড়াল যে, মনোজের মুখটা যেন সোজাসুজি দেখা যায়।

মনোজ একটু হেসে বলল, 'আর, আড়-চোখে ঐ চোখের দিকে চেয়ে হয়তো বিগলিত হয়ে উঠছিলাম, আর মনে-মনে বলছিলাম—তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

কথা তো হচ্ছে দিবাকে নিয়েই। কিন্তু ব্যাপার কি দিবার? সে গিয়ে ঢুকল ঐ বিবরে, কিন্তু বেরোবার যে আর নাম করে না? এরা এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আর কতক্ষণ?

মেয়েটাকে নিয়ে তারা অনেক রহস্য করতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই একটা ভীষণ রহস্য হয়ে উঠছে যেন। এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় ঐ রহস্যজনক বাড়িটার মধ্যে মেয়েটা খুন হয়ে গেল না তো? স্নেহাংশুর এই 'অচিনপুরী'র সবই তো তাদের কাছে অচেনা। ভিতরে কি আছে, বা না আছে সবই তাদের কাছে অজ্ঞাত।

তাদের কিছুক্ষণ আগের উৎকণ্ঠা এবার দুশ্চিন্তায় দাঁড়িয়ে গেল।

নীহার কিছুক্ষণ থেকেই একটু ছটফট করছে। এবার সে বলেই ফেলল, 'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।'

সকলে তাকাল নীহারের মুখের দিকে। নীহারের মুখে ব্যস্ততার ছাপ স্পষ্টই দেখা গেল।

দীপক বলল, 'আমিও তাই বলি। একজনের অন্তত যাওয়া দরকার। নীহার যখন আমাদের পাইলট, তখন ও-ই যাক্।'

দীপকের মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল নীহার, একটু হেসে বলল, 'গাড়ি যারা চালায় লোকে তাদের বলে গাড়োয়ান, তুমি যে আমাকে সম্মান জানিয়ে নতুন আখ্যা দিলে এজন্যে ধন্যবাদ। যাই হোক, আমি যাচ্ছি—'

নীহার রওনা হল। আগাছার উপর পায়ের মজবুত চাপ দিয়ে দিয়ে সে এগতে লাগল। নীহার কিছুটা এগিয়েছে, অমনি দোতলার বারান্দায় আবির্ভূত হল দুটি মূর্তি—দুটি নারীমূর্তি।

চমকে তাকাল ওরা। চোখের রোদ আড়াল করে ভালো করে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পেল, একটি মূর্তি দিবার, অন্যটি—

স্নেহাংশুর দুই নায়িকা ওরা। বেশ ভালো করেই বুঝতে পারা গেল।

ইশারা করছে দিবা। ইশারা করে ডাকছে ওদের সকলকে। ইশারাটা ভালো করে বুঝে নিয়ে যখন ওরা নিশ্চিত হল যে, সত্যিই ওদের ডাকছে, তখন ওদের মনের মধ্যে বুঝি এসে গেল উল্লাস আর আনন্দ।

নীহার একটু এগিয়ে আছে। ওরা চারজন এগিয়ে গিয়ে সঙ্গ নিল তার। তারপর একসঙ্গে যাত্রা করল অচিনপুরীর অন্দরমহলের উদ্দেশে।

ওরা যাত্রা করল। আমরা এবার এখান থেকে বিদায় নিতে পারতাম। বিদায় নিতে পারতাম এইজন্যে যে, অনেকদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা করে তারা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, সে উদ্দেশ্য এবার তাদের সফল হয়েছে। তারা দর্শন পেয়েছে তাদের নায়িকার। তারা অধিকার পেয়ে গিয়েছে, সেই নায়িকার সন্নিকটে যাবারও। সুতরাং তাদেরও কাজ সমাপ্ত, আমাদেরও

কাজের ইতি এখানেই।

আমরা চলে আসব বলে স্থির করেছি, এমন সময়ে হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ম শব্দে আকাশ উচ্চকিত করে বেজে উঠল হুইসল্। বাঁশির শাণিত শব্দে দিগন্তকে দুভাগ করে দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল একটা ট্রেন।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম একটু। দেখতে পেলাম, পাঁচটি পুরুষ-মূর্তি ঐ বারান্দার উপরে এসে দাঁড়াল। ওরা কোনো ইশারা করল না আমাদের। কিন্তু ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে ওভাবে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আমরা বিস্মিত হলাম।

চলেই আমরা আসতাম। কিন্তু চলে আসতে পারা গেল না। ওদের কি হল, তা জানার আগ্রহ হল খুব।

আমাদের কাজের ইতি হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল আমাদের। হয়তো হয়েছিল ইতি। কিন্তু ইতির পরেও থাকে পুনশ্চ।

সুতরাং ওদের ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত করার পরও, পুনশ্চ অনুসরণ করতে হল ওদের।

সব দ্বিধা জলাঞ্জলি দিয়ে, যাবতীয় আগাছার বাধা অগ্রাহ্য করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে আমরা অতি সন্তর্পণে আর অতি সাবধানে প্রবেশ করলাম ঐ অচিনপুরীতে।

বাইরে এখন প্রবল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ঐ পুরীটির অন্দরে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই দেখি ক্রমে কমে আসছে আলো, ক্রমশ জমে উঠছে অন্ধকার। ভিতরটা নির্জন আর নীরব। ভিতরটা অন্ধকার। বিরাট ঘরটির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি আলমারি ও মেঝের মাঝখানে পাথরের মূর্তি বসানো। অন্ধকারে মূর্তিটার চেহারা ভালো করে দেখা গেল না। জানি নে, কিসের শব্দ হল। হয়তো অচেনা পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠেছে চামচিকে।

ডান দিকে প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি কয়েক ধাপ উঠেই দুদিকে দুভাগ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাচ্ছি, এমন সময়ে আর্তনাদের মত করে বেজে উঠল একটা গলা—'কে, কে, কে?'

উত্তর না দিয়ে ধীরে-ধীরে উপরে এসে দাঁড়াতেই একজন বৃদ্ধা এগিয়ে এল, বলল, 'কে?'

তার মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এই জনহীন প্রাসাদের প্রেতিনী বলে মনে হল একে। শরীর শিউরে উঠল।

আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে গো? কে তুমি?'

উত্তর দিলাম না।

এভাবে নিরুত্তর দেখে সে হয়তো ভয় পেয়ে গিয়ে থাকবে। অট্টহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল বুড়িটা।

পাশের একটা ঘর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'কি হল? কি হল তোমার মহামায়া?'

বুড়িটা বলল, 'কে এসেছে দেখ। কালা, না, বোবা, না, বোম্বেটে—কিছু জানি নে। কথার উত্তর দিচ্ছে না কিছুতে।'

তাকে প্রবোধ দেবার মত করে ভিতর থেকে আওয়াজ এল, 'কেউ না, কেউ না। চুপ করো।'

উপরের বারান্দায় ওরা পায়চারি করছে বিচ্ছিন্নভাবে।

দিবা বুঝি এতক্ষণ কথা বলছিল স্নেহাংশুর নায়িকার সঙ্গে। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে বিমর্ষ আর বিষণ্ণ মুখে। বলল, 'একটু আগে আন্দাজে যা বলেছি তাই ঠিক—পাথর, পাথর।'

স্নেহাংশুর মুখের দিকে তাকাল সকলে। তার মুখের দিকে তাকাবার কারণ এই যে, যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, সে স্নেহাংশুরই নায়িকা, এবং তার নায়িকা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব যেন স্নেহাংশুরই একার।

কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার তো! প্রাসাদতুল্য এই বাড়িটার বাসিন্দা নেই আর কেউ। ওরা মাত্র দুজন নাকি বাস করে এখানে—স্নেহাংশুর ঐ নায়িকা আর তার সঙ্গী ঐ বৃদ্ধাটি।

এই বিরাট বাড়িটার মধ্যে বুঝি স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়েই আছে ওরা দুজন। কিন্তু ওরা কারা? এবং ওরা কেনই বা এখানে?

দিবার চোখ-দুটোও যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। স্বপ্নেও যা ভাবেনি, এখানে এসে সেই অসম্ভব একটা পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদের।

দিবা তার সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে একা গিয়ে বসেছে স্নেহাংশুর নায়িকাকে নিয়ে। দক্ষিণ-কোণের ঘরে উঁচু পালঙ্কের উপর বসেছে সে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে। ধীরে-ধীরে সে তাকে প্রশ্ন করছে নানারকম, কিন্তু একটা কথারও উত্তর দিচ্ছে না সে। কেবল অপলক চোখে চেয়ে বসে আছে চুপ করে।

তার হাতটা দিবা নিজের হাতের মধ্যে নিল। কবুতরের গায়ের মত নরম হাতটি যেন কাঁপছে। অনেক দিন হয়তো এমন স্পর্শ পায়নি মেয়েটা।

দিবা বলল, 'মেয়েদের জীবনটাই বেশ মজার, তাই না? তারা কোনো কথা খুলে বলে না, তাই কতজন তাদের নিয়ে কত মজার গল্প বানায়।

কত নাটক লেখে, কত উপন্যাস লেখে। ভারি মজা লাগে এতে আমার। আমার মজা লেগেছিল, তাই তোমাকে দেখার এমন আগ্রহ হয়েছিল আমার। তাই ভাই এত কষ্ট করে এত দূরে আসা।'

একটু থেমে দিবা বলল, 'তবে খুলে বলি। তুমি কিছুই জান না, কিন্তু তোমাকে নিয়ে নাটক তৈরি হয়ে গিয়েছে একটা। সে নাটকে তোমার নাম কি দেওয়া হয়েছে জান?—ফুল্লরা। আরও মজা কি জান?—সে নাটকে ফুল্লরার ভূমিকায় অভিনয় করেছি আমি।'

অপলক চোখে চেয়েই আছে মেয়েটি, কথা বলছে না, কথা বলতে বুঝি পারছে না সে।

দিবা বলল, 'নাটকে তো তোমার নাম হয়েছে ফুল্লরা। তোমার আসল নামটা কি ভাই।'

হাতে একটু চাপ দিয়ে দিবা আবার বলল, 'বলোই-না! কি নাম ভাই তোমার?'

ঠোঁট-দুটো কেঁপে উঠল একটু, অস্ফুটে কি যেন বলল। বুঝতে না পেরে দিবা আবার বলল, 'কি বললে? কি নাম?'

'ইন্দিরা।' বেশ স্পষ্ট করেই সে বলল এবার নিজের নামটা।

তারপর একটু থেমে নিয়ে ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বলব, না আপনি বলব আপনাকে!'

'তুমি বলবে। আমিও প্রথম থেকেই তুমি বলছি।'

একটু ম্লান হাসল ইন্দিরা, তারপর বলল, 'আর, তোমার নাম? তোমার নামটা কি এবার বলো।'

দিবা বলল, 'আমার নাম দিবা—দিবা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এটা আমার শখের নাম, সুখের নাম নয়।'

কিছু বুঝতে না পেরে ইন্দিরা বলল, 'সুখ শখ—ওসব আবার কি? কিছু বুঝলাম না।'

দিবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'শখের নাটকে অভিনয় করি আমি। ও-নামটা আমার সেই অভিনেত্রীর নাম। কিন্তু অন্য-একটা নাম আমার আছে, সেটা আমার নিজের নাম।'

'কি সেটা?'

দরজার দিকে একটু চেয়ে, একটু চাপা গলাতেই বুঝি বলল দিবা, বলল, 'সে নাম রেণুকা।'

দুজন দুজনের নাম শোনামাত্র দুজনের মধ্যে যেন সব পরিচয় হয়ে গেল। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসে অন্তরঙ্গভাবে দুজনে গল্প করতে লাগল।

সব কথা জানাল দিবা। কেন তাদের এখানে আসা, কে কে এসেছে তারা একসঙ্গে। কিভাবে তাকে নিয়ে হঠাৎ একটা নাটক লিখে ফেলা হল। কিভাবে সে এসে যোগ দিল সেই নাটকে অভিনয় করার জন্যে। এবং, কথা যখন বলতে আরম্ভ করল তারা, তখন আর কিছু রেখে-ঢেকে নয়, সব কথা খোলসা করেই সে বলে ফেলল ইন্দিরাকে—কি জন্যে তাকে হতে হয়েছে অভিনেত্রী, সে কথাও।

কথাটা শুনে ইন্দিরা এতটুকু সমবেদনাও জানাল না। নিজের বেদনা নিয়েই সে বিব্রত, সুতরাং অন্যের বেদনায় সে আর যোগ দিতেই পারল না।

একমনে সে শুনে যেতে লাগল দিবার কথা।

এরা এখানে বসে কথা বলছে। তাদের সঙ্গে এসে কখন যে যোগ দিয়েছে মহামায়া, সেদিকে তাদের কোনো লক্ষ্যই ছিল না। মহামায়া এসে বসে পড়েছে মেঝেয়। বসে-বসে গল্প শুনছে ওদের।

আর, যাদের দ্রৌপদী-বেশে এসেছে দিবা, সেই পঞ্চপান্ডব ঘুরে-ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছে ওদিকে এই বাড়িটার চারধার।

সবই কেমন অবাস্তব আর অসম্ভব মনে হচ্ছে তাদের। সবই কেমন অদ্ভুত আর আশ্চর্য। ঐ যে দূরে রেল লাইন। এই যে এদিকে ঝিরঝিরে অপ্রশস্ত জলের ধারা। আশে-পাশে কোনো লোকালয় নেই, চারদিক ফাঁকা। অনেক দূরে-দূরে, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকটি কুঁড়েঘরের মাথা দেখা যাচ্ছে মাত্র।

অনেক দাপট এককালে নিশ্চয় ছিল এই বাড়িটার। অনেক ঐশ্বর্যও নিশ্চয়ই এর ছিল। কিন্তু এখন কেমন নির্জীব আর নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে সমস্তই।

'এই তো নাটক হে।' দীপক বলল স্নেহাংশুকে, 'এই তো জীবননাট্য। এই জীবননাট্যের মাঝখানে রঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞীর মত বসে আছেন তোমার নায়িকা। যার নাম দিয়েছ তুমি ফুল্লরা। চলো, যাই। তোমার ফুল্লরার সঙ্গে একটু উৎফুল্ল হয়ে কথা বলে আসি। আমাদের ধর্মের নামে ছেড়ে দিয়ে তোমার দ্বিতীয়া নায়িকা যে একেবারে নেপথ্যনায়িকা হয়ে রইলেন। ব্যাপার কি হে?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করে উঠল নীহার, 'একেই বলে মেয়ে। এদের চরিত্রই বিচিত্র জিনিস। যাকে বলে চিত্রবিচিত্র। আর্ট আছে, কিন্তু হার্ট নেই।'

দীপক হাসল, বলল, 'বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলো নীহার।'

কিন্তু আর পরিষ্কার করে বলার ইচ্ছে তার নেই। যেটুকু বলেছে, সেইটুকুই তার বক্তব্য। তবু সে বলল, 'ওরা হৃদয়হীন প্রতিমাবিশেষ।'

ঘরের মধ্যে যে কথা হচ্ছে তাও ঐ হৃদয়হীনতা নিয়েই।

মহামায়া বলল, 'নিষ্ঠুর ওরা। ওরা সব পারে। যাকে এত পছন্দ করে বিয়ে করলি, তাকে বৌ করে ঘরে রাখলি নে কেন। তোর চোখ তো পাথরের নয়, তবে কেন তুই ভুল করলি দেখতে? তুই করবি ভুল, আর শাস্তি পাবে অন্যে? এ কোন দেশের রীতি, এ কোন দেশের আইন?'

ইন্দিরার সর্বনাশ যে করে গিয়েছে, তার কথা আলাদা। সে একটা গুণ্ডা, সে একটা বদমায়েস। কিন্তু তুই তো গুণ্ডা-বদমায়েস নোস, তুই একজন শিকারী, ভালো ঘরের ছেলে তুই, যেমন-তেমন মানুষ নোস তুই, তুই বীরশাহীর রাজকুমার। যাকে নিয়ে গেলি তুই রাজরানী করে ঘরে রাখবার জন্যে তাকে তুই—

বাধা দিয়ে উঠল ইন্দিরা, বলল, 'ইস্। চুপ চুপ, চুপ করো তুমি। ওসব কথা থাক, অন্য কথা বলো।'

কিন্তু আজ অন্য আর কি কথা বলার আছে। দুঃখের কাহিনী শোনার লোক তো পাওয়াই দায়, আজ যখন বরাত-জোরে জুটেছে তেমন শ্রোতা, তখন মহামায়া যেন সব কথা বলে ফেলে হাল্কা হয়ে যেতে চায়।

হাল্কা হয়ে যাচ্ছে মহামায়া। ক্রমে-ক্রমে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে সে। যাবতীয় ঘটনা পরিষ্কার করে বলার জন্যে সে যেন ব্যাকুল। সকলের কাছে তো সব কথা এমন অকপটভাবে বলা চলে না! নিজেকে একেবারে নিষ্কলুষ নিষ্পাপ ও মমতাময়ীরূপে চিত্রিত করে এই হতভাগ্য মেয়েটির কাহিনী তো সকলের কাছে বলা চলে না। কিন্তু আজ সে যার কাছে এত দরদ দিয়ে ও আবেগ দিয়ে এত কথা বলছে, তার কাছে অবশ্যই বলা চলে। কেন না, আজ সে যা শুনবে তাই তার কাছে নতুন, তাই তার কাছে পুরোপুরি বিশ্বাস্য।

কবে কিভাবে একটা বোম্বেটে-গোছের লোক ইন্দিরার জীবনকে অভিশপ্ত করে দিল, তার পরে নতুন আশ্বাসের মত কিভাবে এসে দেখা দিল বীরপুরুষের মত একটা শিকারী—সব কাহিনী বলতে লাগল মহামায়া।

যেন রূপকথার গল্প শুনছে; এইরকম কৌতূহল নিয়ে ইন্দিরার মতই অপলক চোখে মহামায়ার দিকে চেয়ে সে বসে-বসে শুনছে সব কাহিনী।

দুঃসময় যখন আসে তখন তা নাকি আসে ঝাঁক বেঁধে। এই প্রাসাদে

পঙ্গপালের মত এসে দেখা দিল দুঃসময়। তাদের পাখার ঝাপটেই বুঝি একে-একে নিভে যেতে লাগল সব আলো। অল্পদিনের মধ্যে শ্মশানপুরী হয়ে উঠল বাড়িটা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মহামায়া, বলল, আমাকে নিল না মুখপোড়া ঐ যম। আমাকে ফেলে রেখে গেল।'

বীরশাহী থেকে ফিরে এল ইন্দিরা, কিন্তু ফিরে এল সে কোথায়? ফিরে এল একটা শ্মশানে। যে দু-চার জন তখনও ছিল, তারাও গেল একে-একে।

'তারা আর খোঁজ নেয় না?' আস্তে জিজ্ঞাসা করল দিবা।

'কারা?' শ্লেষ দিয়ে মহামায়া বলল, 'ঐ রাজাবাহাদুরেরা? বয়েই গেছে তাদের। তারা মানুষ না, তারা পাথর।'

এটা এখন একটা প্রেতপুরীর মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়িতে অমন মড়ক লাগায় সকলে ভয় পেয়ে গিয়েছে, এর ত্রিসীমানা আর কেউ মাড়ায় না। মহামায়া বলল, 'দুটিমাত্র প্রাণী আমরা। জোতজমি কিছু আছে, এই কাশীপুরে কিছু আছে, লাইনের ওপারে সংগ্রামপুরে কিছু আছে, উস্থিতেও আছে। সেসব জায়গা থেকে কিছু-কিছু জোগাড় করে আনি—'

এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দিবা। দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওর সঙ্গীদের কথা মনে হল। বলল, 'ওরা বুঝি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে? ওদের এবার ডাকা যাক্।'

কথাটা শুনেই বুঝি চমকে উঠল ইন্দিরা। যেন শিউরেই উঠল সে। বলল, 'কাদের ডাকবেন?'

কারো মুখোমুখি হতে চায় না ইন্দিরা। নিজেকে নিয়ে ও নিজেব দুর্ভাগ্য নিয়ে সে থাকতে চায় নিভৃতে ও নেপথ্যে।

কিন্তু দিবা তার সঙ্গীদের এখানে ডেকে আনতে চায়নি। সে তাদের কেবলমাত্র ডাকতে চেয়েছে। বেলা হয়ে এসেছে অনেক; শীতের বেলা, তাই তেমন টের পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বেলা হয়েছে অনেকই। এবাব তারা যাবে।

যারা যাবে, তারা যাবেই। তাদের ধরে রাখা যাবে না কখনোই। এটা ইন্দিরাব জীবনের অভিজ্ঞতা। এরাও যদি যাবে, তবে যাক—

'কিন্তু' ইন্দিরা অপলক চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে বলল, 'আলাপ যখন হল, তখন আবার আসবেন তো?'

দিবার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'সত্যি আসবেন। এলে বেশ ভালো লাগবে।'

বিদায় নিল তারা। ইন্দিরা বলল, ‘মহামায়া, এঁকে একটু পৌঁছে দিয়ে এস গেট পর্যন্ত।’

আগে-আগে চলল মহামায়া, পিছনে-পিছনে দিবা।

ছাতে এসে দিবা ডাকল, ‘এই এই এই! আসুন! ন্যাচারাল সিনারি দুনিয়াতে অনেক পাবেন। চলে আসুন।’

ছাতের কিনারে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে ওরা প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে তুমুল তর্ক করছিল। দিবার গলা শুনে ফিরে তাকাল। হয়তো কিছু প্রত্যাশা নিয়েই ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু বৃথাই সে প্রত্যাশা। দিবার সঙ্গে আর কেউ নেই, আছে মাত্র তার দাসী।

॥ সাত ॥

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নীহার বলল, 'আমরা বলদ। চিনির বলদ আমরা।'

নীহারের এ উষ্মার কারণ কি, হঠাৎ বোঝা গেল না। কিন্তু মনোজ বলল অন্য কথা, বলল, 'আমার ধারণা ছিল, আমরা ননীর পুতুল, ঐ রোদে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝি অনেকটা গলে গিয়েছি।'

'অত বিগলিত ভঙ্গিতে কথা বলতে হবে না মনোজ, স্টিয়ারিং-এ একটি পাক দিতে দিতে নীহার বলল, 'ননীর পুতুল হচ্ছে ননী দিয়ে তৈরি করা জিনিস—তার দাম আছে। কিন্তু চিনির বলদ হচ্ছে অন্য ব্যাপার, চিনি দিয়ে তৈরি করা চতুষ্পদ জীব নয়, চিনি বয়ে বেড়ায় যারা, কিন্তু চিনি চেখে দেখা যাদের বরাতে ঘটে না—'

তাকে বাধা দিতে হল না। গাড়ির সামনে একটা চতুষ্পদ জীব পড়ায় সজোরে ব্রেক কষতে গিয়ে নীহারের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আর সকলে কোনো কথা বলছে না। তারা মনমরা হয়ে গিয়েছে কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমন কি দিবাও কোনো কথা বলছে না—তার এমন চুপচাপ থাকার তবু কিছু মানে বোঝা যাচ্ছে, অচিনপুরীর সেই কন্যাটির কথা হয়তো সে একমনে ভাবছে। মেয়েটার দুঃখে হয়তো অভিভূত হয়ে আছে সে।

কিন্তু নীহার কথা বলবেই, তির্-তির্ করতে-করতে ছুটে চলেছে তাদের ক্ষুদে গাড়িটা, তার স্টিয়ারিং নাড়াচাড়া করছে সে, আর কথা বলে চলেছে, বলছে, 'চেখে দেখার কথা বাদ দাও। ওসব ঠাট্টা-রসিকতা থাক্। কিন্তু চোখে দেখাও কি বারণ? যার জন্য ছুটে এলাম এতটা রাস্তা, তার সঙ্গে বাক্যালাপও না-হয় না হল, কিন্তু, ইয়ে—'

দিবা পিছন থেকে বলল, 'অত ব্যস্ত হবার হয়েছে কি? এই তো প্রথম আলাপ হল। আবার আসা যাবে।'

'বয়ে গেছে। আবার আসতে হলে আপনারা দুজনে আসবেন, আপনি ও স্নেহাংশু।'

গাড়ি চলেছে ঘরমুখো। কেউ আর কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণ পরে দিবা বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে।'

একবার হর্ন টিপে রাস্তা সাফ করে নিয়ে নীহার বলল, 'তা ফলে বটে। কিন্তু বেশি সবুর করলে মেওয়া আবার শুকিয়েও যায়।'

নীহারের এই মন্তব্য শুনে অট্টহাস্য করে উঠল সকলে একসঙ্গে। কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না দিবা।

হাসি থেমে গেলে, গলা সাফ করে নিয়ে স্নেহাংশু বলল, 'তাহলে এবার শুনি কথাগুলো। কি কথা হল এতক্ষণ আপনাদের।'

'অনেক কথা, অনেক কথা, অনেক কথা', দিবা বলল, 'সে একটা মহাভারত, সে একটা রামায়ণ। এখানে বসে সব কথা গুছিয়ে বলা যাবে না। চলুন একদিন সকলে মোমিনপুরে। সেখানে জমাট হয়ে বসে বলব সব কথা। নাটকের প্লট পেয়ে যাবেন। তিনটে নাটক লিখতে পারবেন।'

নীহার ওদিক থেকে বলল, 'তা বোধ হয় পারা যাবে। যাকে দেখেছি তাকে নিয়ে তো হবে একটা।'

'সে আবার কে?'

'ওই যে দাসীটা।'

'ওঃ, মহামায়া? মহামায়াকে নিয়ে?' দিবা আশ্চর্য হয়ে বলল।

'ওর নাম বুঝি মহামায়া? সুন্দর নাম। নাটকও সুন্দর হবে। তোমরা সব বুড়ি-বুড়ি বলছ ওকে? বয়স হয়তো হয়েছে, কিন্তু বুড়ি ও নয়। একটা মহিলাকে আগলে থাকতে পারে যে, অত বড় প্রকাণ্ড একটা বাড়িতে —সে না পারে কি হে?'

নীহার বলতে লাগল যে, থাকার মধ্যে তার আছে চোখ, আর আছে মুখ, সেইসঙ্গে তার যদি থাকত কলম তাহলে ইয়ে করে দিত সে একেবারে।

অস্ফুটে দিবা জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ে?'

নীহার বলল, 'হ্যাভক। নাটকে-নাটকে উপন্যাসে-উপন্যাসে একেবারে বন্যা ছুটিয়ে দিত। এই এমন এক-একটা ক্যারেক্টর মাঠে মারা যাচ্ছে কেবল যোগ্য লেখকের অভাবে।'

নীহারের মন্তব্য আর কারো গায়ে তেমন লাগছে না, যেমন লাগছে স্নেহাংশুর গায়ে। কিন্তু লোকটা যে ঠাণ্ডা-প্রকৃতির, তাই এর কোনো উত্তর সে দিল না।

কিন্তু মহামায়াকে নিয়ে অনেকক্ষণ মশগুল হয়ে রইল নীহার। তার চেহারার মধ্যে সে এমন কি দেখেছে তা ও নিজেই জানে। তার বক্তব্য হচ্ছে, ও চেহারা যেমন-তেমন মেয়ের হয় না; শেষ বয়সেই এই, ওরও তো একটা প্রথম বয়স ছিল—

বাধা দিয়ে দিবা বলল, 'ও কথা থাক। অন্য কথা বলুন।'

'অন্য কথা?' একটু ভেবে নিল নীহার, 'তাহলে শোনা যাক স্নেহাংশুর নায়িকার কথা।'

'সে কথা মোমিনপুরে হবে।'

'তবে তো মিটেই গেল। বেশ আপনার কথা শুনি তবে একটু।'

'আমার আবার কি কথা?'

'অভিনয় করছেন কবে থেকে। অভিনয় করছেন কেন। এতে কত ঝুঁকি নিতে হয় জীবনে।'

মনে-মনে হাসল দিবা, তার পর বলল, 'তাহলে আগে আপনি বলুন, আপনি দমকলে কাজ করেন কেন—এতেও তো কত ঝুঁকি। কতজন কত অ্যাকসিডেণ্টে পড়ে, কতজনের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।'

'তা যায়। কিন্তু ওটা আমার জীবিকা।'

'অভিনয়ও আমার জীবিকা।'

'আপনি তো সেল্‌স্‌ গার্ল-এর কাজ করেন চৌরঙ্গীর একটা দোকানে।'

কথাটা শুনে দিবা একা নয়, গাড়িসুদ্ধ সকলেই চমকে উঠল। নীহার এত খবর পেল কোত্থেকে? কোথায় থাকে, কি করে, কোথায় যায়, কেন যায়—সে সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও কেউ যার কিনারা করতে পারে নি, নীহার তার কিনারা পেল কি করে?

স্তব্ধ হয়ে থাকার পর দিবা বলল, 'ওতে কুলোয় না।'

'বাজে কথা। একটা মানুষের এতই চাহিদা?'

হঠাৎ বাধা দিয়ে উঠল মনোজ, বলল, 'বড্ড ব্যক্তিগত ব্যাপার এসে যাচ্ছে। আর, বলো-তো, আমরা নেমে যাই, তুমি ওঁকে নিয়ে একা যাও গল্প করতে-করতে।'

নীহার হেসে উঠল, বলল, 'রাগ না, যেন লক্ষ্মী। এ ব্যবস্থায় উনি যদি রাজী থাকেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমাদের এমন-ভাবে পথে বসিয়ে যাব, তাতেও মন তেমন সায় দিচ্ছে না। তবে চলো, আর কথা না। কথা সব মুলতুবী। কথা সব মোমিনপুরের জন্য তোলা থাক্‌।'

খড়িবেড়িয়া পেরিয়ে এসেছে ওরা। একে-একে ভাসা, পৈলান, ঠাকুর-পুকুরও পার হয়ে এল। আর দূর নয়। এবার তারা এসে গিয়েছে বেহালার কাছেই। প্রাণে বুঝি পুলক এসে গেছে এবার।

মনোজ আবৃত্তি করল কবিতা, নীহার গাড়ি চালাচ্ছে, মাঝে-মাঝে কলকব্জা একটু-আধটু ঠিকঠাক করে নিয়েছে, তাই তাকে উদ্দেশ করে মনোজ বলল—

ধন্য তোমারে হে রাজমিস্ত্রি
চরণপদ্মে নমস্কার।

লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
লও ফিরে তব পুরস্কার।

এক হাতে স্টিয়ারিং ধ'রে অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে নীহার বলল, 'কি পুরস্কার দেবে দাও।'

মনোজ হেসে বলল, 'তোমাকে রাজমিস্ত্রি বলেছি, এইটেই তোমার মস্ত পুরস্কার। এর চেয়ে বেশি আবার কি চাও।'

আজ সকালে ঐ কাশীপুরে মর্মরমূর্তি দেখে যে কয় ছত্র মনোজ আবৃত্তি করেছিল, নীহারের উদ্দেশে ঐ ছত্র কয়টি বলার পর কবিতাটির সেই শেষাংশ সে বলল—

আনন্দময়ী মুরতি তোমার
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা।
অমৃতসরস তোমার পরশ
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল দিবা, বলল, 'বা, আপনি তো সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন। কবিতাটি কিন্তু ভারি সুন্দর।'

'জানেন বুঝি এটা? কি কবিতা বলুন তো?'

দিবা বলল, 'পতিতা।'

নীহার চমকে উঠল যেন, বলল, 'কি?'

দিবা আবার বলল, 'পতিতা। রবি ঠাকুরের লেখা। পড়েন নি? অদ্ভুত সুন্দর কবিতা।'

বড় মজার ব্যাপার বলেই মনে হল বুঝি। মেয়েটা কেবল অভিনয়ই করে না, মেয়েটা কবিতা-টবিতাও তবে পড়ে।

এ কথা নিয়ে আরও কথা হয়তো হত। কিন্তু কথা বলার সময় আর নেই, তারা শখের-বাজার পেরিয়ে এসেছে অনেকক্ষণ, এবার বড়িশার এলাকাও প্রায় পার হয়ে এল। ঐ তো এসে গেল বেহালা।

রায়বাহাদুর রোডের মোড়ে এসে থামল অভিযাত্রী-দল। দম নিয়ে বাঁচল যেন ক্ষুদে গাড়িটা। একে-একে নামল সকলেই। দিবাও নেমে দাঁড়াল।

বিকালের পড়ন্ত রোদ এদিক-ওদিকের বাড়ির কার্নিশে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। সে রোদের দিকে কেউ তাকাল না, সকলে তাকাল রাস্তার দিকে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে দৌড়ে আসছে।

দিবা বলল, 'আমি তবে আসি?'

'আসি মানে? যাবেন কি ভাবে?' বলল নীহার।

'বাস্-এ যাব।'

'তা হয় না।' নীহার বলল, 'উঠে পড়ুন। পোঁছে দিয়ে আসছি। এখনো আছে পেট্রল।'

একটু ঝুলোঝুলি হয়তো হত, কিন্তু পাড়ার ছেলের ভিড় দেখে দিবা উঠে পড়ল গাড়িতে। নীহার স্টার্ট দিল। কারও কাছ থেকে বিদায় নেবার, বা অন্তত হাত তুলে নমস্কার জানাবার সময় পর্যন্ত পেল না দিবা।

হুশ করে হাওয়া হয়ে গেল হাওয়াগাড়িটা।

অবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল মনোজ স্নেহাংশু হরেশ আর দীপক। নীহারের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে তারা। সত্যি, একটা কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ও যে করে বসবেই—এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই।

যে নীহার এতক্ষণ এত কথা বলেছিল সেই নীহার এখন একেবারে চুপ। একমনে সে চালাচ্ছে গাড়িটা। গাড়িতে তার যে কোনো সঙ্গী আছে, তা যেন সে জানেই না।

মোমিনপুর একবালপুর পার হয়ে খিদিরপুরের ব্রিজে উঠে এল তারা। তার পর রেস্-কোর্সের পাশ দিয়ে ছুটল এসপ্লানেডের দিকে। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে বেশ স্পীড দিয়েছে নীহার।

পিছন থেকে দিবা বলল, 'ও কি, করছেন কি? আমাকে নিয়ে কোথাও পালাচ্ছেন নাকি?'

নীহার হেসে বলল, 'পালাতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। কিন্তু পালিয়েও তো নিস্তার নেই। ধরা পড়ে যেতেই হয়। তাই ভয় হচ্ছে।'

'তাই বুঝি? বেশ ভীতু তো আপনি।'

'আপনি যদি একটু অভয় দেন, তব চেষ্টা দেখি।'

নীহারের কথাটা দিবার কানে ধাক্কা দিয়ে হাওয়ায় হারিয়ে গেল।

দিবা বলল. 'ওর মধ্যে বীরত্ব নেই।'

'তবে বীরত্ব কিসে?'

'বীরত্ব হচ্ছে—ভদ্রভাবে আমাকে এস্প্লানেডে নামিয়ে দেওয়ায়।'

'ওতে বীরত্ব হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতা হতে পারে না। ভদ্রতা হচ্ছে—একেবারে আপনার বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দেওয়ায়।'

বেশ মুশকিলই তো হল। দিবা যেন একটু প্রমাদ গণল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এখানে যে আমার একটু কাজ আছে।'

'বেশ তো আমারই-বা তাড়া কি। সেরে নিন কাজ।' নীহার কথাটা বলল দিবাকে একটু পরখ করে দেখার জন্যেই অবশ্য, এবং দিবা কি উত্তর দেয় তা শোনার জন্যে গাড়ির স্পীডও কমিয়ে দিল।

কিন্তু কোনো উত্তর দিল না দিবা।

এসপ্লানেডে এসে গাড়ি থামাল নীহার।

দিবা ধীরে-ধীরে নামল, এক পা এগিয়ে নীহারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'নমস্কার। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আবার দেখা হবে। শিগগিরই একদিন যাব মোমিনপুরে।'

উত্তর দিল না নীহার। একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে কেবল প্রতি-নমস্কার করল দিবাকে।

রাস্তা পার হয়ে দিবা অন্য ফুটপাথ ধরল।

এতক্ষণ এত সপ্রতিভ ভাবে কথা ব'লে, এতক্ষণ এতটা বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে হঠাৎ এখন কেমন যেন বোকা হয়ে গেল নীহার।

কিন্তু বোকা হয়ে যেতে তার বড় আপত্তি। আর কোনো দিকে না চেয়ে সে সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে চলল মৌলালির দিকে। সেখানে গিয়ে সে অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল।

রাস্তার আলো যথেষ্ট নয়। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোতেই সে নজর রাখার চেষ্টা করল। গাড়িটা একটু অন্ধকারে রেখে নীহার দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মোড়ে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রত্যেকটি বাস্-এর দিকে দৃষ্টি রাখল সে, প্রত্যেকটি ট্রামের দিকে। সারা দিন গাড়ি চালিয়ে সে শ্রান্ত, তারপর এতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার খুবই ক্লান্তিকর লাগছে। কিন্তু তার কেমন জেদ চেপে গিয়েছে। সে দাঁড়িয়েই রইল।

দিবা কোনো দিকে না চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধীরে-ধীরে চলেছে। বড় রাস্তা থেকে সে ঢুকল গলিতে। গলিটা একটু আঁকাবাঁকা, দু-একটা বাঁক নিয়ে সে এসে দাঁড়াল একটা দরজার কাছে। কড়া নাড়ল।

নীহার এসেছে পিছন-পিছন, বলল, 'নমস্কার। বাড়ি পর্যন্ত পেশছে দেব বলেছিলাম। পেশছে দিলাম। আজ আসি।'

হঠাৎ এই গলা শুনে চমকে তাকাল দিবা। কিন্তু চমকটা গোপন করার চেষ্টা করে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ।'

নীহার আর দাঁড়াল না। সে সেখান থেকে সোজা চলে এসে তার গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। সে মনে মনে দিগ্বিজয়ের আনন্দ বোধ করতে করতে ফিরে গেল।

॥ আট ॥

অচিনপুরীর সেই নায়িকা আবিষ্কার ক়া এমন আর কি কঠিন কাজ, তার চেয়ে বড়দরের আবিষ্কার যে নীহার করতে পেরেছে, এবং তা তার একার চেষ্টায়, তার কাছে এটা একটা মস্ত গৌরব।

এই গৌরবের আনন্দ নীহার একা-একাই ভোগ করতে লাগল কয়েক-দিন ধরে। কাউকে সে কিছু বলে না। সেদিন কত দূর পর্যন্ত দিবাকে সে পেঁাছে দিয়ে এল, আর কি-কি কথা তার হল—সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নীহার একেবারেই রাজি না। নীহারের এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখে সকলেই কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে। এবং অনেকেই সন্দেহ করছে যে, নীহারের অত বাড়াবাড়ির জবাব নীহার নিশ্চয়ই পেয়েছে, নিশ্চয়ই মেয়েটার কাছ থেকে কড়া কথা সে শুনেছে বিস্তর।

দিন তো কেটে গেল অনেকগুলি। দিবা আসছে কবে মোমিনপুরে? অচিনপুরীর ফুল্লরার গল্প সে কবে এসে বলবে? কি-কি কথা হল তার সঙ্গে দিবার, ঐ একটা ভগ্নপ্রাসাদের নেপথ্যে থাকা সত্ত্বেও সে যে একটা নাটকের নায়িকা হয়ে গিয়েছে, এ খবর জেনে মেয়েটা বলল কি কি? সব কথা এসে বলে যাক দিবা। তাদের মনের ভার দিয়ে যাক একটু হাল্কা করে!

ফুল্লরার কথা এরা ভাবছে বটে, কিন্তু আসলে তাদের যত ভাবনা ঐ দিবাকে নিয়েই। ফুল্লরার গল্প শোনার জন্যে ব্যাকুলতা তারা দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে তারা ব্যাকুল দিবার জন্যে। এই মেয়েটার উপর তাদের কেমন-যেন একটা টান হয়ে গিয়েছে। সকলের সঙ্গে সমানভাবে ও সহজ-ভাবে মিশবার আশ্চর্য শক্তি আছে মেয়েটার।

দিবা অবশ্য ফুল্লরার কথা ভাবে, বাস্তবিকই ফুল্লরার জন্যেই ফুল্লরাকে ভাবে। এই চরিত্রটি অভিনয় করেছে সে। হায় রে চরিত্র। মেয়েটাকে ঐভাবে ভেবে নিতে এতটুকু বাধল না নাট্যকারের! অমন একটা বিষাদ নিয়ে কতটা বিলাসই করেছেন ঐ নাট্যকার।

গভীর রাত্রে ফুল্লরার মুখ ভেসে ওঠে দিবার চোখের সামনে। নির্জন ঐ প্রাসাদপুরীতেও নেমেছে অন্ধকার। ওটা যেন ঠিক প্রাসাদ আর নেই, ওটা একটা প্রেতপুরী। সেখানে এখন কেমন নির্জীব ও নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে ঐ ফুল্লরা—ঐ ইন্দিরা! কি করছে এখন মহামায়া?

দিবার ইচ্ছে হচ্ছে, সে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে আনবে ঐ মেয়েটিকে। সত্যি, সে যদি পুরুষ হত, তাহলে—

না, না, না। বিশ্বাস নেই। পুরুষ হলে হয়তো এমনভাবে সে ভাবতেই পারত না। পুরুষ হলে হয়তো সে হত ঐ হীরালাল, কিংবা বীরশাহীর শিকারী সেই জমিদার-নন্দন। তার চেয়ে এই বেশ আছে, এই ভালো আছে।

একটা তন্দ্রা এসেছিল তার চোখে, তন্দ্রার মধ্যে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ঐ বিরাট প্রাসাদের মস্ত সিঁড়ি দিয়ে কে-যেন গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠল দিবা, 'মহামায়া, ইন্দিরা ইন্দিরা!'

পাশের বিছানা থেকে মনোরঞ্জন ডাক দিল, 'এই, এই। এই রেণু, রেণুকা, হল কি। স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

পাশ ফিরে শুয়ে রেণুকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'উঃ!'

না, সত্যি সে ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে না ঐ মেয়েটির কথা। যতই চেষ্টা করে না-ভাববার, ততই ভাবনা এসে ভর করে তার মনের মধ্যে।

ঠিকই। ঠিক আঁচই করেছে ওরা। ওরা নমস্য ব্যক্তি। ঠিকই ওরা ধরেছে। সেও একজন পতিতা, আর অচিনপুরীর মেয়েটিও একজন পতিতা।

ধন্য তোমারে হে নাটককার
চরণপদ্মে নমস্কার।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজকর্ম সেরে তৈরি হয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দিবা—না, আর দিবা নয়, এবার আমরা ওর আসল নামটাই উল্লেখ করব—সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রেণুকা বলল, 'বৌদি, আমি বেরচ্ছি। একটু লক্ষ্য রেখো লক্ষ্মীটি।'

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে রান্নাঘর থেকে মলিনা বেরিয়ে আসছিল, পাঁচ-বছর আর সাত-বছরের তার ছেলে-দুটি কি-যেন বায়না ধরল, তাদের একটু সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল মলিনা, বলল, 'ভাগ্যিস বললে, তা না হলে বুঝি লক্ষ্যই রাখতাম না।'

রেণুকা হাসল, বলল, 'কথা বলার উপায় নেই। কথা বললেই ফোঁশ করে ওঠো কেন?'

'স্বভাব। স্বভাব।' মলিনা বলল, 'কিন্তু আজকে আর কোথাও যাওয়া নেই তো?'

'না। বিকেলেই ফিরব।'

'দোকান থেকেই বাড়ি? সওদাগিরি করেই ছুটি! বেশ।'

দু-জনে একটু হাসি-ঠাট্টা করল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মলিনা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মুখখানা যা সুন্দর হচ্ছে দিন-কে-দিন, আমি পুরুষ মানুষ হলে কী যে কাণ্ড হয়ে যেত এতদিন!'

রেণুকা বলল, 'তোমার মুখ দেখে আমারও ঠিক ঐ কথাই মনে হচ্ছে বৌদি। কিন্তু ভাগ্যে বুঝি এ জন্মে আর মিটবে না আমাদের কারোই সাধ।'

এদের দুজনের সাধ বুঝি পূর্ণ হবার কথা না। কিন্তু এমন সাধ তো জেগেছে আরও বহু মানুষের মনে; তাদের সাধই কি পূর্ণ হয়েছে?

কিন্তু ওসব কথা নিয়ে ঝগড়া করার সময় এখন নয়। দোকান খুলবে সকাল আটটায়। এখন সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। ঠিক সময়-মত গিয়ে পৌঁছনো চাই সেখানে।

লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটা মস্ত দোকানে সেল্‌স্‌ গার্ল-এর কাজ করে রেণুকা। রেণুকার মত আরও কয়েকটি মেয়ে আছে সেখানে। একটু চটপটে হওয়া চাই, একটু স্মার্ট হওয়া চাই, কথাবার্তা বলতে জানা চাই, ছিমছাম থাকা চাই, ও সেইসঙ্গে চাই চেহারার একটু জৌলুস। রেণুকার এসব আছে। লেখাপড়া বেশি শিখতে পারে নি, তাই অন্য কোনো কাজের যোগ্যতা তার নেই। কিন্তু এ কাজে যোগ্যতা তার আছে।

যোগ্যতা যেমন তার আছে, তেমনি ঝুঁকিও আছে এ কাজে। কখনো মালিকের, কখনো-বা মালিকপুত্রদের উপদ্রবও আছে। কারও মনে কোনো রকম সাধ জেগে উঠলে তা পূরণ করার জন্যে চাপও সহ্য করতে হয়। আবার, তেমন শৌখিন বা চৌকশ খরিদ্দারও মাঝে-মাঝে ভীষণ উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ইলেক্‌ট্রিক গুড্‌সের দোকান। নানারকম বৈদ্যুতিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে তাদের কাজ। রেডিয়ো, রেফ্রিজারেটর, ট্রানজিস্টার তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পাখা—নানা ধরনের ফ্যান; এবং অন্যান্য পণ্য।

এইসব পণ্যের মধ্যে জীবন্ত পণ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেল্‌স্‌ গার্লদের।

কাজটা মন্দ না। অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। অনেক রকম চেহারা, অনেক রকম লোভ, অনেক রকম লালসা। তেমন যোগ্যতা যদি থাকত রেণুকার, তাহলে এদের সকলের ছবি সে এঁকে রাখতে পারত।

ওরা বিবিধ পণ্যের মধ্যে পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা নিয়ে প্রায়ই তাই

তার সঙ্গে রসিকতা করে মলিনা। সে রসিকতায় হাসিমুখেই যোগ দেয় রেণুকা।

বলা যায় না, মালিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে না পারলে কখন হয়তো বরখাস্ত হয়ে যাবে কাজ থেকে। এইজন্যেই রেণুকা নতুন আর-একটা জীবিকারও ব্যবস্থা রেখেছে।

বিকেলে ঘরে ফিরে এল রেণুকা। এণ্টালির কনভেণ্ট রোডে। ঘরে ফিরেই সে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে নিচের ঘরের মধ্য থেকে মলিনা সাড়া দিল, বলল, 'কে? রেণু নাকি?'

কিন্তু গলাটা রেণুকা বুঝি শুনতে পায় নি, তাই কোনো উত্তর দিল না।

কনভেণ্ট রোডে দিনের পর দিন কেটে চলেছে এইভাবে। মোমিনপুরের কথা মনে হয়। কিন্তু ওদিকে আজ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠল না। আর, যেতে যেন তেমন গরজও বোধ করছে না সে।

কিন্তু মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে নীহারের কথা। আশ্চর্য মানুষ বটে! সব খবর সে জোগাড় করে বসে আছে। এমন কি তার বাড়িটাও দেখে গিয়েছে সে। কে বলতে পারে, হয়তো একদিন হঠাৎ সে হাজির হবে এখানে।

অথচ ওদের কথা অত ভাবে না রেণুকা। যতটা ভাবে ঐ মেয়েটার কথা—ঐ ফুল্লরার কথা, সেই ইন্দিরার কথা। আশ্চর্য দুঃখের জীবন বটে তার।

মেয়েটাকে নিয়ে মলিনার সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছে। সেই গল্প শুনে মেয়েটাকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে মলিনারও।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দুজনে নিচের বারান্দায় বসে গল্প করছিল এইসব ব্যাপার নিয়েই। বেহালার সেই দলের মানুষদের নিয়েও কথা হল অনেক। কথাগুলো মলিনা শুনছে, আর তার কেমন আশ্চর্য লাগছে। অতগুলো পুরুষ নিয়ে হল্লা করতে-করতে সে যে গেল, তাতে তার ভয় করল না।

রেণুকা হাসল, বলল, 'ভয় কি? ওদের বুকের পাটা নেই। পুরুষদের ভয় করলেই তারা পেয়ে বসে, তাদের পরোয়া না করলেই তারা বেকুব হয়ে যায়। উসখুস করে, কিন্তু উপদ্রব করতে পারে না।'

'তা হবে।' মলিনা বলল, 'হরেক রকম মানুষ তুমি দেখছ। তুমিই ভালো বুঝবে। কিন্তু আমরা ঘরকুণো জীব, আমাদের চলতে হয় একটু ভয়ে-ভয়েই।'

'ওসব বাজে কথা অন্যকে বোলো। তুমি একটুও ভয় করে চলো না!'

'ভয় করিনে, বলো কি?' মলিনা বাধা দিয়ে বলল, 'উনি বাড়িতে ঢোকা মাত্র তটস্থ হয়ে থাকি। নুন থেকে চুণ—সবদিকে পুরো নজর রাখতে হয় না? ভোরে উঠেই বেরিয়ে যান টিউশনিতে, ফিরে এসেই মুখে কিছু গুঁজে দৌড় দেন ইস্কুলে। বিকেলে আবার টিউশনি। তাই, তটস্থ থাকি—'

একটু থেমে মলিনা একটু হাসল, তার পর বলল, 'একটা মানুষ নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি। তুমি এত মানুষ সামাল দাও কি করে? সদাগরি দোকানে কর সওদাগিরি, কত মানুষ আসে-যায় সেখানে; তার পর আছে নাটক—'

'কৌশলটা কি জান বৌদি?' রেণুকা হেসে বলল, 'কখনো কোনো একজনের সঙ্গে একা থাকবে না। কয়েকটা পুরুষ যখন একত্র থাকবে, তখন তার মধ্যে গিয়ে বসবে। ওদের প্রত্যেকের মনে এমন ধারণা এনে দেবে যেন তাকেই তোমার পছন্দ। তাহলেই প্রত্যেকে তোমার পাহারাদার হয়ে দাড়াবে। কেউ তোমার চুলের ডগাটি পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না। এইভাবেই তো কাটাচ্ছি দিন। দেখা যাক, কতদিন চলে এভাবে।'

একটু থেমে রেণুকা বলল, 'কিন্তু ঐ নীহার বসু ছেলেটা কেমন যেন উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। সেদিন ধাওয়া করেছিল এই বাড়ি পর্যন্ত।'

'কি চায় ও?'

'কে জানে! আর কি চায় জানি নে। কিন্তু ভাব জমাতে যে চায়—তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি। কিন্তু ওকে নিয়েও আমার কেন যেন খুব চিন্তা হয়। ও কাজ করে দমকলে। এত চটপটে আর এত ছফফটে, হঠাৎ আবার কোনো অ্যাকসিডেন্ট করে না বসে!'

রেণুকার কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল মলিনা। হয়তো একটু সমবেদনাই জানাল রেণুকাকে। কিন্তু কিসের এই সমবেদনা?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল তারা। অন্ধকার বারান্দায় বসে আছে তারা। রান্নাঘরে কড়াইতে ডাল ফুটছে। ঘরে আলো জেবলে মলিনার ছেলেদুটি খাতা-বই মেঝেয় ছড়িয়ে নিয়ে পড়াশুনার নাম করে কলহ করছে।

এখান থেকে মলিনা তাদের একটা ধমক দিল।

রেণুকা বলল, 'ওকে দেখলেই আমার কেমন বেচারা বলে মনে হয়। আর, ও জানেও না যে, আমি বিবাহিতা; ও জানে না যে, আমার স্বামী আছেন। জীবিকার জন্যে আমি ছুটোছুটি করি, আমার জীবনটা তাই ওদের কাছে কেমন সস্তা হয়ে গিয়েছে।'

বারিক লেনের বাড়িটার কথা মনে পড়ে আজও। মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটার কথাও। দমকলের পাগলা-ঘণ্টার আওয়াজ এখনো যেন বেজে চলেছে তার কানের মধ্যে। দেখতে-দেখতে কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়ে গেল। সব গেল—সব গেল। সব উহ্য হয়ে গেল। রেণুকাও যেত নিশ্চয়ই উহ্য হয়ে, কিন্তু বেঁচে গেল সে। কে তাকে উদ্ধার করল?

কে উদ্ধার করল তাকে? সকৃতজ্ঞভাবে তার নাম মনে-মনে মাত্র উচ্চারণ করল রেণুকা। তাকে মৃত্যুর মধ্যে থেকে যে লুফে তুলে নিয়ে এল তার কাছে সারাটা জীবন সে ঋণী। সে ঋণ সে শোধ করে চলেছে।

কিন্তু বারিক লেনের সেই বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়িটার কথা মনে হওয়া মাত্র আর-একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির কথা আজকাল তার কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল দুটি চোখের কথা, যে-চোখে দীপ্তি আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই। সেই ভীষণ নিঃসঙ্গতা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আনবার কি কেউ নেই এই দুনিয়ায়?

নীহার তো এত উৎসাহী, নীহারের তো এত উদ্যোগ; নীহারের কাজই তো হচ্ছে বিপদের মুখ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা। ও পারে না এ কাজটা করতে? আলেয়ার পিছনে এভাবে ঘুরে-ঘুরে না বেড়িয়ে ওকে আলোর পিছনে একটু ধাওয়া করতে শেখালে কেমন হয়। আগুন নিয়ে খেলা করছে নীহার, আগুন নিয়েই ও সংগ্রাম করছে। ওরই ফাঁকে ও যাক্-না একটু ওই সংগ্রামপুরে।

'চলো বৌদি, চলো একদিন ওই সংগ্রামপুরে। আর কেউ না—আমরা দুজন। বেলেঘাটা স্টেশন থেকে ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনে উঠব। সটান চলে যাব।'

রেণুকার কাছ থেকে ইন্দিরার গল্প শুনে-শুনে মলিনার মনে কৌতূহল জমেই আছে, রেণুকার এই প্রস্তাব শুনে মলিনা উৎসাহ দেখাল, বলল, 'সত্যি, গেলে হয় একদিন।'

মলিনার মনে কেবল যে কৌতূহলই জমে আছে, এমন নয়; তার মনে জমে আছে করুণাও। তাই বলল, সে যাবেই। কোথাও যাওয়া হয় না কখনো, এই উপলক্ষে একদিন তবু বেরনো যাবে বাড়ি থেকে। কিন্তু একটা ছুটির দিন দেখে যেতে হবে, যাতে বাড়িতে থাকতে পারে মিণ্টু আর পিণ্টুর বাবা।

যা কথা হল তদনুযায়ী কাজ করার জন্যে রেণুকার ব্যবস্থার সীমা নেই। একদিন সে তৈরি হয়ে নিল। মলিনাকে নিয়ে বের হল কনভেণ্ট রোড থেকে।

ওরা বেরিয়ে গিয়েছে, তার কিছুক্ষণ বাদেই দরজায় কড়া নাড়ল কে যেন।

শব্দ শুনে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল অপরেশ। একজন অচেনা লোক সামনে দাঁড়িয়ে, তার আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অপরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চান?'

• নীহার এসেছে। নীহার বলল, 'এটা দিবা দেবীর বাড়ি না? তিনি কি আছেন?'

অপরেশের দুটি ছেলে মিণ্টু আর পিণ্টু এসে তাদের বাবার পিছনে দাঁড়াল। তাদের একটু সরে দাঁড়াতে ব'লে অপরেশ বলল, 'একটু আগে বেরিয়ে গেলেন তিনি।'

'ইশ, অল্পের জন্যে তাহলে দেখা হল না।' নীহার আপশোস ক'রে বলল।

'কিছু খবর দেবার থাকলে বলে যেতে পারেন। তিনি ফিরে এলে বলতে পারব।'

নীহার একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বলল, 'বলবেন—বেহালা থেকে এসেছিলাম। ওঁর একদিন যাবার কথা ছিল মোমিনপুরে। না যাওয়ায় চিন্তা হল—কোনো অসুখবিসুখ করল কিনা। তাই খবর নিতে এসে-ছিলাম।'

'আপনার নাম কি বলব?'

'আমার নাম? আমার নাম নীহার বসু।'

অপরেশ শুনেছে এ নাম। অপরেশ শুনেছে এর কথা। বলল, 'ওঃ, আপনি? আপনি বুঝি কাজ করেন ফায়ার ব্রিগেডে?'

আশ্চর্যও হল, সেইসঙ্গে আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেল নীহার, তার সম্বন্ধে তা হলে দিবা একেবারে উদাসীন নয়? এ লক্ষণটা তো মন্দ না।

'আপনি ওঁর কে হন?' জিজ্ঞাসা করল নীহার।

'আমি?' অপরেশ বলল, 'আমি ওর কেউ না। এককালে ছিলাম ওর মাস্টারমশায়।'

'আপনার ছাত্রী উনি তবে?'

অপরেশ একটু ভদ্রতা করল, বলল, 'আসুন। একটু বিশ্রাম করে যান। এত দূর থেকে এসেছেন।'

নীহারের আপত্তি নেই। ভিতরে গিয়ে বারান্দায় মোড়া পেতে বসল দুজন।

মাস্টারি করে অপরেশ। মাস্টারি-জীবন তার অনেক দিন হয়ে গেল। একটু সাদামাটা টাইপের মানুষ সে। একটু বুঝি সরলই।

অপরেশ গল্প করতে লাগল। রেণুকার উপর তার মমতা খুবই। রেণুকার কষ্ট তার নিজেরই কষ্টের সমান। অপরেশ বলল, 'ওর জীবনটা একটা ট্র্যাজেডি।'

উৎসুক হয়ে উঠল নীহার, কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। কোনো প্রশ্ন না করে সে তাকাল অপরেশের দিকে।

সেই 'পতিতা' কবিতা আবৃত্তির কথা থেকে কথা আরম্ভ হয়ে গেল। যার নাম রেণুকা, তার আর-একটা নাম হয়ে গলে দিবা। বারিক লেনের বাড়ির কথা হল। অগ্নিকাণ্ডের কথা হল। সেই আগুন থেকে আশ্চর্যভাবে যে তাকে বাঁচিয়েছিল তার কথা হল।

কোনো আশ্রয় ছিল না মেয়েটার। যে তাকে রক্ষা করেছিল, সেই হল তার রক্ষক, সেই বিবাহ করল রেণুকাকে। রেণুকার জীবন ভরসায় ভরে গেল।

বেশ সুখে কাটছিল দিন। দুটি বছর বেশ সুখে কেটে গেল। তার পর এল বিপর্যয়, বিনা-নোটিশে। 'আপনারা দমকলের লোক, এসব বিপর্যয়ের মধ্যে আপনাদের পড়তেই হয়।'

দু বছর বাদে বেলেঘাটায় ঘটে গেল এক কাণ্ড। আগুন লেগেছিল সেখানে। ফায়ারব্রিগেড গিয়েছিল, সেখানে যায় সেই দমকলের লোকের সঙ্গে দমকলকর্মী মনোরঞ্জনও।

চমকে তাকাল নীহার, বলল, 'তার পর?'

'আগুন নেভাতে গিয়ে, কয়েকজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল মনোরঞ্জনের—সে পুড়ে ঝলসে গেল।'

'কি যেন নাম বললেন তাঁর?' নীহার জিজ্ঞাসা করল।

অপরেশ বলল, 'মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এ নাম যেন শুনেছে নীহার। তার যেন বেশ মনে হচ্ছে এ নাম তার চেনা। তাদের অনেক সহকর্মী এখনো যেন মাঝে-মাঝে উল্লেখ করে এই নাম!

নীহার বলল, 'দিবা দেবী তাঁর স্ত্রী? তিনি দিবা দেবীর স্বামী? তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি শয্যাশায়ী। অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছেন একেবারে। আছেন এখানেই।'

'আশ্চর্য কাণ্ড তো বলতে হবে। এতদিন কথাটা এমন ভাবে চেপে

রেখে দিয়েছেন তিনি? কথাটা এমনভাবে চেপে রাখার মানে হয় না কোনো।'

কিন্তু মানে হয় কি না হয়, সে কথা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তর্ক তাই আর করা হল না। কিন্তু অপরেশ বলল, 'বড় অভিমানী মেয়ে ও। এতটুকু কাল থেকে ওকে চিনি। ওর বাবা সামান্য কাজ করতেন। অভিমানীও বটে, অহঙ্কারীও। কেউ ওকে করুণা করে, এটা বুঝি ওর ইচ্ছে নয়। তাই নিজের কথা প্রকাশ করতে চায় না। কত কষ্ট করে আর কত ঝুঁকি নিয়ে টাকা রোজগার করে, সবই তো জানেন আপনারা।'

নীহার বলল, 'কিন্তু আজ গেলেন কোথায়? আজ তো ছুটির দিন।'

কোথায় গিয়েছে তা জানার পর নীহার যেন চিন্তিত হয়ে উঠল, ব্যস্ত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল সে, বলল, 'যাই।'

অপরেশও উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সোজা বেহালায় চললেন বুঝি?'

'উঁহুঁ।' নীহার বলল, 'এটা চিন্তার বিষয় হল, দুশ্চিন্তারই বিষয়। মাত্র দুজন মহিলার ওভাবে ওখানে যাওয়া ঠিক হল না।'

'কেন? জায়গাটা ভালো না বুঝি?'

'জায়গা ভালো।' নীহার বলল, 'কিন্তু ওখানকার দাসীটা নাকি ভীষণ জীব। ফুল্লরা যার নাম, তার জীবনের ট্র্যাজিডির মূলে নাকি আছে ও— ওই মহামায়া।'

আর কোনো কথা বলল না নীহার, অপরেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে এল বেলেঘাটা স্টেশনে। খোঁজ করে জানল, ডায়মণ্ডহারবারের পরের ট্রেন ছাড়বে আধ ঘণ্টা বাদে।

॥ সমাপ্ত ॥